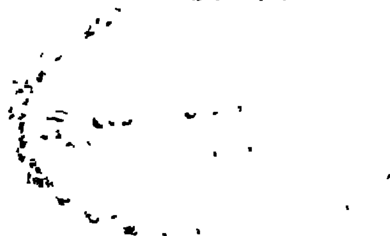
মা

—ম্যাক্সিম গর্কী



অনুবাদক

বিমল সেন

বর্মণ পাবলিশিং হাউস

৭২, হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা ৭

প্রকাশক
ব্রজবিহারী বর্মণ রায়
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

৪র্থ সংস্করণ

সাধারণ সংস্করণ
এক টাকা বারো আনা
বোর্ড বাধাই—ছ' টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ
পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪৭, মধুরায় লেন, কলিকাতা

ম্যাক্‌সিম গর্কীর 'মা'কে আজ বাঙালীর হাতে দেবার লগ্ন এসেছে। বহু আন্দোলন উত্তেজনার পর বাঙালী আজ বুঝতে পেরেছে, জাতির চরম দুর্ভাগ্য তার ধন-বৈষম্য। একদল খাটে আর উপোস করে, আর একদল খায় এবং খাটায়। একদল ন্যায্য প্রাপ্য হ'তে বঞ্চিত—সে বঞ্চনা-কৌশলের নাম আইন; আর একদল চাহিদার বেশি গ্রাস ক'রে থাকে—সে বুভুক্ষার যুক্তি আভিজাত্য! শুধু রুশে নয়, সর্বদেশেই এবং বাঙলায়ও এই অবস্থা। চাই আজ মার্কসের নব-নীতি,—চাই আজ মজুরদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন।

সেই পরিবর্তনের অগ্রদূত গর্কীর 'মা'। 'মা' সমাজ-বিপ্লবীদের অগ্নিবেদ। এই আন্দোলনের সমস্ত মনস্তত্ত্ব এতে ফুটে উঠেছে নিখুঁতভাবে এবং অগ্নিবর্ষী ভাষায়। সমস্ত দেশের সমস্ত বিপ্লবী যেন 'মা'র মধ্যে এসে ঘনীভূত হয়েছে। বছরের পর বছর 'মা' সকল দেশের—বিশেষ ক'রে বাঙলার এই বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত ক'রে এসেছে। 'মা' পড়লেই এ কথাটা সবার আগে মনে হবে।

কিন্তু এই নব-নীতির পথ কোনো দেশেই সহজ হয় নি। বহু দ্বিধা, বহু সংস্কার, বহু নির্যাতন, বহু নিরাশায় দুলতে

তুলতে একে এগোতে হয়েছে। সামনে দাঁড়িয়েছে এর পর্বতোপম দুর্লঙ্ঘ্য বাধা; এ হয়তো থম্‌কে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পিছোয়নি; বাধা বিদীর্ণ ক'রে দেশের অন্তরে প্রবেশ করেছে। গর্কী 'মা'র চরিত্রে এই রুশ-জননীর অগ্রগতিকে রূপ দিয়েছেন। যে মা প্রথমে দুঃখকে একমাত্র ভাগ্যলিপি মনে করেছিলেন—সমাজ-বিপ্লবের নামে আঁৎকে উঠেছেন, দিনে দশবার ক'রে মানুষের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কেঁদে পড়েছেন ভগবানের কাছে, তিনিই ধীরে ধীরে দীক্ষিত হলেন পূর্ণ বিপ্লব-মন্ত্রে—ভগবানের বিরুদ্ধে করলেন বিদ্রোহ। বাধা হ'ল তাঁর দূর। প্রচ্ছদপটে শিল্পী 'মা'র এই ভাবটাই পরিস্ফুট করেছেন—নব-নীতি আপাত-অলঙ্ঘ্য পর্বতসমান বাধার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যে বাধা অপসারিত ক'রে পথ ক'রে নেবেই।

আজ 'মা'কে পাঠকসমাজের হাতে দেবার সংগে সংগে আমরাও এটা স্থির জান্‌ছি যে আমাদের দেশেও আজ এ নব-নীতি অবজ্ঞাত, উপহসিত,—বাধাপ্রাপ্ত হ'লেও অদূর ভবিষ্যতে এর পথ খোলসা হবে, না হয়ে পারে না। আমরা সেই ভবিষ্যতের দিন গুন্‌ছি।

১৯৩৩ বিমল সেন

প্রথম খণ্ড

মা

এক

রোজ ভোরে কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ তীব্র ধ্বনিতে মজুর-পল্লির ধূম্র-পংকিল আর্দ্র বাতাস কম্পিত হয়, আর ছোট ছোট কুঠ্‌রি থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বেরিয়ে আসে দলে দলে মজুর। অপ্রচুর নিদ্রায় আড়ষ্ঠ দেহ, কালো মুখ। ঊষার কন্‌কনে হাওয়া সংকীর্ণ মেঠো পথ · তারই মধ্য দিয়ে চ'লে তারা গিয়ে ঢুকে পড়ে সেই উঁচু পাথরের-খাঁচাটার মধ্যে, যেটা তাদের গ্রাস করবার জন্ম কাদা-ভরা পথের দিকে চেয়ে আছে শত শত হলদে তৈলাক্ত চক্ষু বিস্তার ক'রে। পায়ের তলায় কাদা চট্‌ চট্‌ করতে থাকে কাদাও যেন তাদের ভাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ করছে; কানে আসে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠের কর্কশ ধ্বনি, ক্রুদ্ধ তিক্ত গালাগালির শব্দ তারপর সে সব ডুবে যায় কলের গম্ভীর ধ্বনিতে, বাষ্পের অসন্তোষ-ভরা গর্জনে। কালো কঠিন চিম্‌নি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় পল্লির বহু ঊর্ধ্বে। সন্ধ্যায় কারখানা তাদের ছেড়ে দেয় দগ্ধ-সর্বস্ব ছাইয়ের মতো। আবার তারা পথ বেয়ে চলে ধোঁয়া-মলিন মুখ মেশিন-তেলের বোট্‌কা গন্ধ ক্ষুধার্ত শাদা দাঁত কিন্তু সজীব, আনন্দপূর্ণ কণ্ঠ। সেদিনকার মতো কঠিন শ্রম-দাসত্ব হ'তে তারা মুক্তি পেয়েছে, এখন শুধু বাড়ি ফেরা, খাওয়া এবং ঘুম।

গোটা দিনটা হজম করে ওই কারখানা। কল মানুষকে ইচ্ছামতো শোষণ করে·· জীবন থেকে একটা দিন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় ·

মানুষ অজ্ঞাতসারে এগোয় তার কবরের দিকে। তবু তারা খুশি·· তাড়ি আছে, আমোদ আছে। আর কি চাই!

ছুটির দিনে মজুররা ঘুমোয় দশটা তক···তারপর উঠে' সব চেয়ে পছন্দসই পোষাকটি প'রে গির্জায় যায় যাবার আগে ধর্ম-বিমুখতার জন্ম ছোটদের একচোট ব'কে নেয়, ফিরে এসে পিরগ খায়; তারপর সন্ধ্যাতক ঘুমোয়। সন্ধ্যায় পথের ওপর আনন্দের মেলা বসে। পথ শুকনো হ'ক, তবু ওভার-সু যাদের আছে প'রে বেরোয় বর্ষা না থাকলেও ছাতা নিয়ে পথে নামে। যার যা' আছে তাই নিয়ে সে স্যাঙাতদের ছাড়িয়ে উঠতে চায়, পরস্পর দেখা হ'লে কল-কারখানার কথাই বলে ফোরম্যানকে গালি দেয়, কলসংক্রান্ত কথা নিয়েই মাথা ঘামায়। ঘরে ফিরে স্ত্রীর সংগে কলহ করে, মাঝে মাঝে তাদের নির্মমভাবে মারে। যুবকেরা মদ খায়, এর-ওর বাড়ি আড্ডা দিয়ে ফেরে, অশ্লীল গান গায়, নাচে, কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ করে। অনেক রাতে বাড়ি ফি'রে আসে—নোংরা গা, ছেঁড়া পোশাক, ছিন্ন মুখ·· কা'কে মেরেছে তারই বড়াই করে, কার কাছে পিটুনি খেয়েছে, তারই অপমানের কান্না। কখনো কখনো বাপ মা-ই তাদের তুলে আনেন পথ কিংবা তাড়িখানা থেকে, মাতাল অবস্থায়। কটুকণ্ঠে গালমন্দ করেন স্পঞ্জের মতো মদসিক্ত শরীরে দু'দশ ঘা বসান তারপর রীতিমতো শুইয়ে দেন · পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে কাজে পাঠান।

বহু বছর ব্যাপী অবসাদের ফলে ক্ষুধা-শক্তি তাদের লোপ পেয়েছে·· ক্ষুধা উদ্রেক করার জন্ত তারা গ্রাসের পর গ্রাস মদ চালায়। ক্রমে মদের মাত্রা চড়ে যায় প্রত্যেক প্রাণেই মাথা তু'লে দাঁড়ায় একটা অবোধ্য পীড়াদায়ক অলক্ষী, যা' তাদের ফুটতে চায়। এই অশান্তিকর উদ্বেগের বোঝা হাল্কা করার জন্তই তারা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়টি নিয়েও হানাহানি

করে হিংস্র পশুর মতো· কখনো আহতাংগ হয়, কখনো মরে। এই প্রচ্ছন্ন হিংস্রতা ধীরে ধীরে বেড়ে চলে জীবনে। তারা জন্মে আত্মার এই পীড়া নিয়ে। এ তাদের পিতৃধন। কালো ছায়ার মতো কবর পর্যন্ত লেগে থাকবে সংগে। জীবনকে করবে উদ্দেশ্যহীন, নিষ্ঠুরতা এবং পাশবিক উত্তেজনায় কলংকিত।

চিরকাল · বছরের পর বছর · জীবন-নদী ব'য়ে এসেছে এমনি ধারায়। মন্থর, একঘেয়ে তার গতি পংকিল তার স্রোত। দিনের পর দিন তারা একই কাজ ক'রে চলে রুটিনের মতো জীবনের এ ধারা বদলাবার ইচ্ছে বা অবসর যেন কারো নেই।

নতুন কেউ যখন পল্লিতে আসে, নতুন ব'লেই দু'চারদিন সে তাদের কৌতূহল উদ্রেক করে তার কাছে ভিন্ মুলুকের গল্প শুনে, সবাই বোঝে সর্বত্রই মজুরের ঐ এক অবস্থা। নবাগতের ওপর আর কোনো আকর্ষণ থাকে না।

মাঝে মাঝে কোনো নয়া লোক এসে এমন-সব অদ্ভুত কথা বলে যা' মজুর-পল্লিতে কেউ কখনো শোনেনি। তারা তার কথা কান পেতে শোনে · বিশ্বাসও করেনা, তর্কও করেনা। কারো মধ্যে জেগে ওঠে অন্ধ বিক্ষোভ, কেউ হয় ভীত বিব্রত, কেউ হয়ে ওঠে এক অজানা লাভের ক্ষীণ সম্ভাবনায় চঞ্চল। তারা পানের মাত্রা চড়িয়ে দেয়, যাতে এই অনাবশ্যক বিরক্তিকর উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলতে পারে। নবাগতকে যেন তারা ভয়ের চোখে দেখে সে হয়তো তাদের মধ্যে এমন-কিছু এনে ফেলবে যা' তাদের সহজ জীবন-স্রোতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করবে। তারা আশাই করেনা যে তাদের অবস্থারও আবার উন্নতি হ'তে পারে। প্রত্যেক সংস্কারকে

তারা সংশয়ের চোখে দেখে · ভাবে, শেষ পর্যন্ত এ শুধু তাদের বোঝা বাড়াবে মাত্র। তাই তারা নবাগতদের এড়িয়ে চলে।

এমনি ক'রে মজুরদের পঞ্চাশ বছরের জীবন কেটে যায়।

*　　*　　*

কামার মাইকেল ভ্লাশভের জীবনও কেটে যাচ্ছিল এমনি ধারায়। গম্ভীর কালো মুখ, সন্দেহ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ছোট ছোট চোখ, অবিশ্বাস-ভরা হাসি, উদ্ধত ব্যবহার, কারখানার ফোরম্যান এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও কেয়ার করেনা, কাজেই কামায় কম। ফি ছুটির দিনে কাউকে মারা চাই; কাজেই পাড়ার সবাই তাকে ভয় করে, অপছন্দ করে। মারতে গিয়েও ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসে। শত্রুর সাড়া পেলেই ভ্লাশভ হাতের কাছে গাছ, পাথর, লোহা যা' পায় তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। সব চেয়ে ভয়ানক তার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন লোহার শলাকার মতো শত্রুকে বিদ্ধ করে সে চোখের সাম্‌নাসামনি যে পড়ে, সেই বোঝে কী এক হিংস্র ভয়-ডরহীন নিষ্ঠুর জল্লাদের কবলে সে পড়েছে। মুখের ওপরে এসে-পড়া ঘন চুলের ফাঁকে ফাঁকে তার হলদে দাঁত ভয়ংকর ভাবে কট-মট করতে থাকে। 'দূরহ নারকী কীট'—ব'লে সে তর্জন ক'রে ওঠে শত্রুদল চকিতে রণে ভংগ দিয়ে গালি দিতে দিতে পালায়। মাথা খাড়া ক'রে দাঁতের মধ্যে ছোট মোটা একটা চুরুট চেপে সে তাদের পিছু নেয়, আর চালেঞ্জ করে, কোন্ ব্যাটা মরতে চাস, আয়। কেউ চায়না।

এমনি সে খুব কম কথা বলে, শুধু 'নারকী কীট' এই কথাটা তার মুখে লেগেই আছে। কারখানার কর্তাদের থেকে শুরু ক'রে পুলিশদের পর্যন্ত সে ঐ ব'লে ডাকে। বাড়িতে গিয়ে বউকে পর্যন্ত বলে, 'নারকী কীট', আমার পোশাক যে ছিঁড়ে গেল দেখতে পাস না?

তার ছেলে পেভেলের বয়স যখন চোদ্দ, তখন একদিন তার চুল ধ'রে টানতে গেলো ; পেভেল পলকে একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে বললো, ছুঁয়োনা

কী—পিতা কৈফিয়ৎ তলবের সুরে গর্জে উঠলো।

পেভেল অবিচলিত কণ্ঠে বললো, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছি না। ব'লে হাতুড়িটা সে একবার সদর্পে মাথার ওপরে ঘোরালো।

পিতা তার দিকে চাইলেন, তারপর লোমবহুল হাত দু'খানা ছেলের পিঠে রেখে হেসে বললেন, বহুৎ আচ্ছা। ধীরে ধীরে তার বুক ভেঙে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে এলো ব'লে উঠলেন, 'নারকী কীট'

এর কিছুকাল পরে বউকে একদিন ডেকে বললো, আমার কাছে আর টাকা চেয়োনা। ছেলেই এবার থেকে তোমায় খাওয়াবে।

স্ত্রী সাহস ক'রে প্রশ্ন করলো, আর তুমি বুঝি মদ খেয়ে সব ওড়াবে ?

সে কথায় তোর কাজ কি, 'নারকী কীট' কোথাকার !

সেই থেকে মরণ অবধি তিন বছর ছেলেকে সে চোখ চেয়ে দেখেনি, ছেলের সংগে কথা বলেনি।

মরলো সে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে। পাঁচদিন ধরে বিছানায় গড়াচ্ছে সমস্ত অংগ কালো হ'য়ে গেছে দাঁত কট্‌মট্ করছে, চোখ বোজা। মাঝে মাঝে ব্যথা যখন বড়ই অসহ্য হয়, বউকে ডেকে বলে, আর্সেনিক দাও, বিষ দাও।

বউ ডাক্তার ডাকলো। ডাক্তার পুলটিশের ব্যবস্থা করলেন, বললেন অচিরে একে হাসপাতালে নিয়ে অস্ত্র করা দরকার।

মাইকেল গর্জে উঠলো, গোল্লায় যাও। আমি নিজে নিজেই মরতে পারব, 'নারকী কীট' কোথাকার।

ডাক্তার চ'লে গেলে বউ সজল চোখে জেদ করতে লাগলো, অন্ন করাও।

সে হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বউকে ভয় দেখিয়ে বললো, কোন্ সাহসে ওকথা বলিস ; জানিস, আমি ভালো হ'য়ে উঠলে তোর বিপদ ?

ভোরে কারখানার বাঁশি বাজার সংগে সংগেই সে মারা গেলো। বউ একটু কাঁদলো, ছেলে মোটেই না। পাড়া-পড়শীরা বললো, বউটার হাড় জুড়িয়েছে, মাইকেল মরেছে। একজন ব'লে উঠলো, মরেনি, পশুর মতো পচতে পচতে জীবনপাত করেছে।

গোর দিয়ে যে যার ঘরে চ'লে গেলো· দীর্ঘকাল ব'সে রইলো শুধু মাইকেলের কুকুরটা কবরের তাজা মাটির ওপর ব'সে নিরবে সে কার স্নেহ-কোমল পরশের অপেক্ষা করছিল।

দুই

দু'হপ্তা পরে এক রবিবারে পেভেল বাড়ি ফিরলো মাতাল হ'য়ে টলতে টলতে পড়লো গিয়ে ঘরের এক কোনায়—পিতার মতো টেবিলের ওপর ঘুষি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মা, খাবার।

মা উঠে গিয়ে তার পাশটিতে বসলেন, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ছেলের মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। ছেলে মাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো, জলদি খাবার!

'বোকা ছেলে!' দুঃখ-ভরা স্নেহ-সজল কণ্ঠে মা তাকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কোনমতে জিভটাকে টেনে জড়িতস্বরে পেভেল বললো, আমি তামাক খাবো, বাবার পাইপটা এনে দাও।

এই প্রথম সে মাতাল হয়েছে। মদে তার শরীর নিস্তেজ হয়েছে কিন্তু জ্ঞান লোপ পায়নি। বারে বারে একটা প্রশ্ন তার মগজে এসে ঘা খেতে লাগলো, 'মাতাল ? মাতাল ?'—মা যত আদর করেন, তত তার অস্থিরতা বাড়ে—মায়ের করুণ দৃষ্টি তাকে ব্যথা দেয় সে কাঁদতে চায় কিন্তু পারে না। মাতলামি দিয়ে উদ্গত ক্রন্দনকে রোধ করতে যায়। মা তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ধীরে ধীরে বলেন, কেন এ কাজ করিস বাবা ? এ তো তোর কর্তব্য নয় !

সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, বমি করে—মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দেন—ভিজে তোয়ালে দিয়ে উষ্ণ কপাল ঢেকে দেন। সে একটু সুস্থ হয়—কিন্তু তার চারপাশে সব-কিছু যেন দুলছে—তার চোখের পাতা ভারি—মুখে নোংরা টক আস্বাদ। চোখের পাতার মধ্য দিয়ে মায়ের বড় মুখখানির দিকে চায় আর এলোমেলো চিন্তা করে, হয়তো আমার এখনো মদ খাবার বয়স হয়নি। অন্য সবাই খায়, তাদের তো কিছু হয়না—আমি শুধু ভুগি।

দূরে কোনো স্থান হ'তে মায়ের কোমল কণ্ঠ ভেসে আসে, তুই মাতাল হ'লে তোর এ বুড়ো মাকে কি ক'রে খেতে দিবি বাবা ?

চোখ বুজে সে বলে, সবাইতো খায়।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। ছেলে মিথ্যে বলেনি। তিনি নিজেই জানেন, শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোনো স্থান জোটেনা মজুরদের আনন্দ করার · মদ ছাড়া আর কোনো বিলাসিতা তাদের কপালে নেই—তবু বলেন, খাসনি, খাসনি বাবা। তোর বাবা মদ খেয়ে আমাকে জীবন-ভোর দুঃখ-দুর্দশায় ডুবিয়ে রেখে গেছেন· তুই তোর মায়ের ওপর দয়া কর। করবিনি বাবা ?

পেভেল মায়ের কোমল-কাতর কথাগুলি কান পেতে শোনে। পিতার জীবদ্দশায় মা ছিলেন নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা, ভীতা ·সে কথা মনে পড়ে। পিতার ভয়ে বাইরে বাইরেই ঘুরতো ব'লে মা যেন তার কাছে প্রায় অপরিচিতই র'য়ে গেছেন, আজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইলো। লম্বা, ঈষৎ নম্র দেহ দীর্ঘবর্ষব্যাপী শ্রমে এবং স্বামীর নির্যাতনে তা' যেন ভেঙে পড়েছে চলেন নিঃশব্দে, একদিকে ঈষৎ হেলে সর্বদা যেন কোন-কিছু হ'তে আঘাত পাবার ভয়। প্রশস্ত গোলগাল মুখ কপালে চিন্তার রেখা বার্ধক্যে চর্ম লোল এক জোড় কালো চোখ উদ্বেগ এবং বিষাদে ভরা· ডান ভুরুতে একটা গভীর কাটা দাগ, ফলে ভুরুটা যেন একটু উঁচুতে ঠেলে উঠেছে—ডান কানটাও একটু লম্বা বাম কানটার চাইতে—দেখলে মনে হয়, কান যেন কি শুনবে, এই আতংকে উন্মুখ। গভীর কালো চুলের মাঝে মাঝে শাদা শাদা গুচ্ছ, যেন সেগুলি আঘাতের চিহ্ন। কোমল, করুণ বাধ্য· এই মা। দু'চোখ দিয়ে তার জল গড়াচ্চে ধীরে ধীরে।

ছেলে কোমল অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বললো, চুপ কর মা, কেঁদোনা, আমায় জল দাও।

মা উঠলেন, বললেন, বরফজল এনে দিচ্ছি।

কিন্তু যখন মা ফিরলেন তখন সে নিদ্রিত।

পান-পাত্র টেবিলের ওপর রেখে মা নিরবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বাইরে মজুরদের মাতলামি-ভরা সংগীত, গালাগালি এবং চিৎকার।

* * * *

আবার দিন ব'য়ে চললো তেমনি একটানা সুরের মতো শুধু এ বাড়ি হ'তে আগের সে মাতলামি, সে অশান্তি লোপ পেতে লাগলো। পল্লির অন্যান্য বাড়ি হ'তে এ বাড়ি একটু স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠলো।

বাড়িখানি পল্লির একপ্রান্তে, একটা ঢালু জায়গায়। তিনটি কামরা, একটি রান্নাঘর, একটি ছোট কুঠরি। মায়ের শোবার ঘর রান্নাঘর হ'তে একটি ছাদ পর্যন্ত উঁচু পার্টিশনে ভিন্ন করা। ঘরের মাত্র একতৃতীয়াংশ জুড়ে এই দু'টো কামরা। বাকিটা একটা চৌকো কামরা, তাতে দু'খানা জানালা, কোনায় পেভেলের বিছানা, তার সামনে একটা টেবিল, একটা বেঞ্চি, কয়েকখানা চেয়ার, একটা ছোট আরশিওয়ালা হাত-ধোয়ার পাত্র, একটা ট্রাঙ্ক, একটা ঘড়ি এবং দু'টো আইকন।

অন্যান্য সবাই যেমন দিন কাটায় পেভেলও চেষ্টা করছিলো তেমনি ভাবে দিন কাটাতে। একজন যুবক যা' করে থাকে, সব-কিছু সে করলো একটা বেহালা কিনলো, সার্ট, রঙীন নেকটাই, জুতো, ছড়ি কোন-কিছুই আর তার বাদ রইলো না। বাহ্যত সে সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদেরই মতো সান্ধ্যভোজে যায় নাচে মদ খায়, তারপর মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে, বুক জ্বলে, মুখ চোখ মলিন হয়। আবার মা প্রশ্ন করেন, কালকের দিন ভালো কাটলো বাবা?

ক্ষুব্ধ বিরক্ত হ'য়ে সে ব'লে ওঠে, ও গোরস্থানের মতো নিরস ··সবাই যেন এক-একটা মেশিন তার চেয়ে মাছ ধরতে কি শিকার করতে যাবো।

কিন্তু মাছ ধরাও হ'য়ে উঠলো না, শিকার করাও হ'য়ে উঠলো না।

ধীরে ধীরে সে সকলের চলা-পথ ত্যাগ ক'রে অন্য এক পথে এসে দাঁড়ালো। মজলিসে যাওয়া তার ক্রমশ কমে এলো। ছুটির দিনে যদিও সে কোথাও বেরিয়ে যায় আর কখনো মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফেরে না। মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, ছেলের চোখ-মুখ যেন কি একটা অনুপ্রেরণায় ক্রমশ গম্ভীর কঠিন, তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে ··যেন সব-সময়ই তার মন জ্বলছে

কোনো-কিছুর ওপর ক্রোধে অথবা যেন একটা গোপন ক্ষত অহর্নিশ তাকে খোঁচাচ্ছে। বন্ধুরা আসতো প্রথম প্রথম। কিন্তু কোনোদিন তাকে বাড়ি না পেয়ে আসা ছেড়ে দিলো। মা ছেলের এই স্বাতন্ত্র্য দেখে খুশিও হলেন, শংকিতও হলেন। ছেলে এদিকেও টলছে না, ওদিকেও টলছে না, রুটিন-বাঁধা জীবনও তার নয় সে চলেছে দৃঢ় নিষ্ঠায়, অটুট সংকল্পে কোন এক গোপন পথে, · তাই মায়ের শংকা।

বাড়িতে সে বই নিয়ে আসতে লাগলো। প্রথম প্রথম সে লুকিয়ে পড়তো, পড়ে লুকিয়ে রাখতো। মাঝে মাঝে বই থেকে অংশবিশেষ কাগজে নকল ক'রে কাগজখানাও লুকিয়ে ফেলতো। মা-ছেলেতে কথাবার্তা বড় একটা হ'ত না। দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যায় হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া শেষ ক'রে ছেলে বই নিয়ে বসতো, অনেক রাত পর্যন্ত পড়া চলতো। ছুটির দিনে ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতো, ফিরতো অনেক রাতে। তার ভাষা মার্জিত হ'তে লাগলো, মা তার মুখে নতুন অজানা শব্দ শুনে অবাক হ'য়ে যেতেন। মায়ের শংকা বাড়তো। ছেলে বই আনে, ছবি আনে, ঘর সাজায়, ফিটফাট হ'য়ে থাকে। মাতলামি নেই, গালাগালি নেই; ছেলে কি সন্ন্যাসী হল? খুব সম্ভব শহরের কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তাই বা কি ক'রে হ'বে? তাতে তো টাকা দরকার·· ছেলে প্রায় সব টাকাই তো এনে মায়ের হাতে দেয় ·

এমনি ক'রে দু'বছর কাটলো।

* * *

একদিন সান্ধ্যভোজের পর পেভেল ঘরের এক কোণে ব'সে পড়ছে··· মাথার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প ·রান্নাঘরের বাসন-পত্র মুক্ত ক'রে মা

সন্তর্পণে ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ছেলে মাথা তু'লে নিঃশব্দে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইলো।

কিছু না পাশা। এমনি এলুম,—তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন মা এই কথা ব'লে; কিন্তু চোখে তার উদ্বেগের সুস্পষ্ট ছাপ। এক মুহূর্ত রান্নাঘরে স্থির, চিন্তামগ্ন, অভিনিবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হাতমুখ ধুয়ে ফেলে আবার ছেলের কাছে এলেন, বললেন মৃদু-কোমল সুরে, একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই বাবা, দিন-রাত সব সময় কেবল পড়িস কেন?

বইখানা একপাশে সরিয়ে রেখে পেভেল বললো, মা বোসো। মা ছেলের পাশে বসলেন তাঁর দেহ ঋজু হ'য়ে উঠলো ভীষণ একটা-কিছু শোনার বেদনায় উৎকণ্ঠায়। তাঁর দিকে না চেয়েই পেভেল ধীরে কিন্তু দৃঢ়তা-মাখানো সুরে বলতে লাগলো, আমি নিষিদ্ধ বই পড়ছি। এ বই নিষিদ্ধ—কারণ এতে মজুর-জীবনের খাটি ছবি আঁকা। এ বই ছাপা হয় গোপনে আর আমার কাছে এ বই আছে, এ যদি প্রকাশ পায়, তাহ'লে আমার জেল হবে; আমার জেল হবে, আমি সত্য জানতে চাই এই অপরাধে।

মার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো বড় বড় চোখ মেলে ছেলের দিকে তিনি চাইলেন মনে হ'ল, এ যেন ছেলে নয়, এ নতুন অপরিচিত। ছেলের জন্ম দরদে তাঁর বুক ভ'রে উঠলো, কেন এমন কাজ করিস বাবা?

মার দিকে চেয়ে শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে পেভেল বললো, আমি সত্য জানতে চাই মা।

ছেলের শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বরে রহস্য-সংকুল ভীষণ কি একটা সংকল্পের সাড়া পেয়ে মা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর চোখে নিরব অশ্রু দেখা দিলো।

কেঁদোনা মা।—পেভেলের মৃদু দরদ-ভরা কণ্ঠ মার কানে এসে ঠেকলো

বিদায়-বাণীর মতো। পেভেল বলতে লাগলো, মা ভেবে দেখ দেখি, একি জীবন কাটাচ্ছ তুমি। তোমার বয়স চল্লিশ বছর কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচা কি একটা দিনও বেঁচেছ তুমি? বাবা তোমাকে মারতেন। আমি বুঝি তাঁর জীবন-ভরা দুঃখের ঝাল ঝাড়তেন তোমার গায়ে—দুঃখ তাঁকে পিষ্ট ক'রে ফেলতো, কিন্তু সে দুঃখের মূল কি, তা তিনি জানতেন না। তিরিশ বছর খেটে গেছেন। কারখানায় যখন সবেমাত্র দু'টি দালান, তখন থেকে তিনি খাটতে শুরু করেন—এখন সেখানে সাত-সাতটা দালান। কল সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু মানুষ মরে—কলের জন্য খাটতে খাটতে মরে—

আতংক এবং আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে মা শুনতে লাগলেন। ছেলের চোখ জ্বলছে এক অপরূপ সুন্দর দীপ্তিতে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, মার আরো কাছে মুখ নিয়ে, তাঁর সজল চোখের দিকে চেয়ে বললো, আনন্দ তুমি কি পেয়েছ জীবনে? তোমার অতীত জীবন। মনে রাখার মতো কতটুকু ছিল তাতে?

মা করুণভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন দুঃখ এবং আনন্দ মেশানো এক অজ্ঞাত নতুন ভাব তাঁর ব্যথিত উদ্বিগ্ন অন্তরের ওপর ছড়িয়ে পড়লো শান্ত-প্রলেপের মতো। নিজের সম্বন্ধে, নিজ জীবন সম্পর্কে এমন কথা এই প্রথম কানে এলো তাঁর। যৌবনে তাঁর মনেও একদিন আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, বিদ্রোহ ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছিল—কিন্তু তা' বহুদিন হল নিঃশেষে চাপা প'ড়ে গেছে। আজ যেন সেই আগুন নতুন ক'রে উসকে উঠছে। চিরদিন তারা শুধু দুঃখের অভিযোগই ক'রে এসেছে কিন্তু এ দুঃখের কারণ কি, প্রতিকারই বা কি—তা' নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। আজ সে সমস্যা সমাধান করবার মহৎ সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছেলে গৌরবে, আনন্দে তাঁর

বুক ভ'রে উঠলো ছেলের বক্তৃতার মাঝখানে ব'লে উঠলেন, তা কি করতে চাও তুমি ?

পাঠ করতে হবে এবং প'ড়ে অন্যকে শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের মজুরদের পাঠ করা অত্যন্ত দরকার আমাদের শিক্ষা করতে হবে, বুঝতে হবে জীবন কেন আমাদের পক্ষে এত দুর্বহ।

মার বলতে ইচ্ছা হ'ল, বাছা, তুমি কি করবে ? ওরা যে তোমায় পিষে ফেলবে। তোমার প্রাণ যাবে। কিন্তু ছেলের আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে সাহস হ'ল না। ছেলে অগ্নিগর্ভ ভাষায় মনের জ্বালা ব্যক্ত ক'রে যায়, মা সচকিত হ'য়ে নিম্নস্বরে সুধোন, তাই নাকি পাশা ?

হাঁ, মা—ছেলে দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়। তারপর মাকে সে বলে সেই সব লোকের কথা, যারা চায় শুধু মানুষের মংগল, যারা চায় শুধু মানুষের অন্তরে সত্যের বীজ বপন করতে এবং এই অপরাধে তারা পশুর মতো নিহত হয় জেলে যায়, নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করে, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় মানুষের দুষমন যারা তাদের হাতে। আবেগের সংগে বলে, এমন-সব লোক আমি দেখেছি মা · যারা দুনিয়ার সেরা লোক।

মা আবার বলতে যান, তাই নাকি পাশা ? কিন্তু বলা হয় না। তাঁর ছেলেকে এমন সব বিপজ্জনক কথা বলতে শিখিয়েছে যারা, তাদের গল্প শুনে শংকিত হতে থাকেন। ছেলে মার হাত ধ'রে প্রগাঢ় স্বরে ডাকে, মা। মা বিচলিত হন। বলেন, আমি কিছু করবনা বাছা, শুধু তুই সাবধানে থকিস সাবধানে থাকিস।

কিন্তু কি হ'তে সাবধানে থাকবে, তা খুঁজে না পেয়ে ব'লে ফেলেন, তুই বড় রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস। তারপর তাঁর স্নেহ-ভরা দৃষ্টি দিয়ে পুত্রের সুগঠিত দেহখানি যেন আলিংগন করে বলেন, তুই যেমন খুশি চল, আমি বাধা দেবনা

শুধু একটা কথা মনে রাখিস আমার, অসতর্ক হ'য়ে কথা বলিস না · লোকদের নজরে নজরে রাখিস ওরা সবাই পরস্পরকে ঘৃণা করে অন্যের অনিষ্ট ক'রে খুশি হয় নিছক আমোদের লোভে মানুষকে পীড়া দেয় যেই তাদের দোষ দিতে যাবি, বিচার করবি, অমনি তারা তোকে ঘৃণা করবে, তোর সর্বনাশ করবে।

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পেভেল মায়ের এই বেদনাময় অভিজ্ঞতার উপদেশ শুনলো, তারপর মার কথা শেষ হ'লে বললো, জানি মা কি শোচনীয় এই মানুষের দল। কিন্তু যেদিন উপলব্ধি করলুম, পৃথিবীতে একটা সত্য আছে, মানুষ আমার চোখে নতুনতর, সুন্দরতর শ্রীতে দেখা দিলো। শৈশবে আমি মানুষকে শিখেছিলুম ভয় করতে, একটু বড় হ'য়ে করেছি ঘৃণা আজ নতুন চোখে দেখছি সবাইকে সবার জন্যই আজ আমি দুঃখিত। কেন জানিনা আমার হৃদয় কোমল হ'য়ে এলো, যখন আমি বুঝলুম মানুষের ভিতর একটা সত্য আছে পাপ এবং পংকিলতার জন্য সকল মানুষই দায়ী নয়।—

বলতে বলতে পেভেলের কণ্ঠ নিরব হয়—কান পেতে যেন শোনে প্রাণের ভিতরের কি এক অস্ফুট বাণী, তারপর চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলে ওঠে, এমনি ক'রেই সত্য বেঁচে থাকে।

পেভেল ঘুমোয়, মা তাকে আশীর্বাদ ক'রে নিজের ঘরে চ'লে যান।

তিন

মাঝ হপ্তায় এক ছুটির দিনে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পেভেল মাকে বলে, মা, শনিবার জনকয়েক লোক আসার কথা আছে।

কারা ?

দু'চারজন এ পল্লিরই লোক—বাকি শহর থেকে আসবে।

শহর থেকে ? মাথা নেড়ে মা বললেন, পরক্ষণেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পেভেল ব্যথিত হ'য়ে বললো, এ কি মা, কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে ?

জামার হাতায় চোখ মুছে মা বললেন, জানিনা, কান্না পাচ্ছে।

ঘরের এদিক-ওদিক পাইচারি ক'রে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে পেভেল প্রশ্ন করলো, ভয় পাচ্ছ মা ?

মা ঘাড় নাড়লেন, হাঁ—শহরের লোক, কে জানে কেমন—

পেভেল নিচু হ'য়ে মার দিকে চাইলো, তারপর ঈষৎ আহত এবং ক্রুদ্ধভাবে বললো, এই ভয়ই আমাদের সকল সর্বনাশের মূল—যারা কর্তা তারা এই ভয়কে ষোল-আনা কাজে লাগায়—আমাদের উত্তরোত্তর ভীত ক'রে তোলে। শোনো মা—মানুষ যতদিন ভয়ে কাঁপবে, ততদিন তাকে পচে পচে মরতে হবে—আমাদের সাহসী হ'তে হবে, আজ সেদিন এসেছে।

তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, ভয় খাও, আর যা' কর, তারা দবেই।

মা করুণভাবে বললেন, রাগ করিস নি বাবা, কি ক'রে ভয় না পেয়ে থাকি বল—চিরটা জনম যে আমার ভয়ে ভয়েই কেটেছে।

ছেলে আরও নরম হ'য়ে বলে, ক্ষমা করো মা, কিন্তু আমি বন্দোবস্ত বদলাতে পারব না।

* * *

তিনদিন ধ'রে যার প্রাণে কাঁপুনি—ভাবেন, যারা আসছে বাড়িতে, না জানি তারা কী ভয়ংকর লোক—তাঁর গা শিউরে ওঠে।

শেষে শনিবার এলো। রাত্রে পেভেল মাকে বললো, মা, আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি, ওরা এলে বসিয়ো, বলো এক্ষুণি আস্‌ছি। আর ভয় খেয়ো না—তারাও অন্য সবারই মতো মানুষ।

মা প্রায় মূর্ছিত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে পড়েন।

বাইরে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। কে যেন তার মধ্য দিয়ে শিষ্‌ দিতে দিতে এগোচ্ছে—শব্দ নিকট হ'তে নিকটতর হ'য়ে জানালার কাছে এসে পড়লো—পায়ের শব্দ শোনা গেলো—মা ভীত চকিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন।—দোর খু'লে গেলো—প্রথমে দেখা গেলো একটা প্রকাণ্ড হ্যাট্, তলায় অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ। তারপর ঢুকলো একটি ক্ষীণ আনত দেহ—দেহকে ঋজু ক'রে ডান হাত তু'লে আগন্তুক অভিবাদন করলো, নমস্কার।

মা নিরবে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বললেন, পেভেল ফেরেনি এখনো।

নবাগত নিরুত্তরে নিরুদ্বিগ্নভাবে লোমের কোটটা ছেড়ে রেখে গা থেকে পুঞ্জিত তুষার ঝেড়ে ফেলতে লাগলো। তারপর চারদিক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে টেবিলের ওপর আরাম ক'রে ব'সে মার সংগে আলাপ জুড়ে দিলো, এটা কি ভাড়াটে-বাড়ি না আপনাদের নিজেদের ?

ভাড়াটে।

বাড়িটা তো বিশেষ ভালো না।

পাশা এক্ষুণি আসবে। বসো।

বসেছি তো। আচ্ছা, মা, তোমার কপালে ও দাগটা কে ক'রে দিলে?

প্রশ্নকর্তার ঈষৎ হাস্য এবং প্রচ্ছন্ন ইংগিতে আহতা হ'য়ে মা একটু কঠিন সুরে বললেন, তা' দিয়ে তোমার দরকার কি?

রাগ করোনা, মা। আমার মার কপালেও অমন একটা দাগ ছিল তাঁর মুচি স্বামী লোহার ফর্মা দিয়ে আঘাত করেছিল কি না ইনি ছিলেন খোপানি, উনি ছিলেন মুচি মাকে সে কী মার মারতেন ভয়ে আমার গায়ের চামড়া যেন ফেটে যেতে চাইতো।

মার রাগ জল হ'য়ে গেলো এ কথায়। এরপর দু'জনের আলাপ জ'মে উঠলো। মা ভাবলেন, এর মতো যদি আর সবাই হয়!

আগন্তুকের নাম এণ্ড্রি।

এণ্ড্রির পর এল একটি মেয়ে—ন্যাটাশা। মাঝারি চেহারা, মাথাভরা ঘন কালো চুল, সাধারণ পোশাক, হাসিমুখ, মধুর স্পষ্ট কণ্ঠ, স্বাস্থ্য-নিটোল দেহ, নিবিড় নীল দু'টি চোখ মার প্রাণ খুশিতে স্নেহে ভ'রে উঠলো··· মনে হ'ল, এ যেন তাঁরই হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে আবার তাঁর কোলে ফিরে এসেছে।

এর পরে এলো নিকোলাই—মজুর-পল্লির নামজাদা চোর বৃদ্ধ দানিয়েলের ছেলে। মা অবাক হ'য়ে বললেন, তুমি, এখানে?

পেভেল বাড়ি আছে?

না।

নিকোলাই তখন ঘরের দিকে চেয়ে বললো, সুপ্রভাত ন্যাণ্ডাৎ।

ন্যাটাশা হাসিমুখে নিকোলাইর করমর্দন করলেন।

মা অবাক হ'য়ে গেলেন, নিকোলাইও তবে এই দলে আছে।

এর পরে এলো ইয়াকোভ—কারখানার পাহারাদার শোমোভের ছেলে। তার সংগে আর একটি ছেলে—সে অপরিচিত হলেও ভীষণদর্শন নয়।

সব্বার শেষে এলো পেভেল—কারখানার দু'জন মজুরকে সংগে নিয়ে।

মা ছেলেকে প্রশ্ন করলেন ধীরে ধীরে, এরাই কি তোর সেই বে-আইনী সভার লোক?

হাঁ, ব'লে পেভেল ন্তাভাৎদের কাছে চ'লে গেলো।

মা মনে মনে বলতে লাগলেন, বলে কি, এরা তো দুধের ছেলে।

ঘরের মধ্যে ততক্ষণে মজলিশ ব'সে গেছে। আগন্তুকদল টেবিলের চারদিকে উন্মুখ হ'য়ে বসেছে। এককোনে ল্যাম্পের নিচে ন্তাটাশা একখানা বই খুলে পড়ছে, 'মানুষ কেন এমন হীনভাবে জীবন-যাপন ক'রে বুঝতে হ'লে'—

—এবং মানুষ কেন এতো হীন হয় বুঝতে হ'লে—এগু্ জুড়ে দিলো।

—'আগে দেখতে হ'বে, কেমন ভাবে তারা জীবন-যাত্রা শুরু করেছিল'

বই থেকে ন্তাটাশা সেই আদিম অসভ্যদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী, তাদের গুহাবাস, পাথরের অস্ত্রে শিকার প্রভৃতির সরল বর্ণনা পড়ে যেতে লাগলো। মা ভাবলেন, এ তো বুনো লোকদের গল্প, এতে আবার বে-আইনী কি আছে।

হঠাৎ নিকোলাইর অসন্তুষ্টি-ভরা কণ্ঠে বেজে উঠলো, ওসব থাক। মানুষ কেমন ক'রে জীবন কাটিয়েছে তা শুনতে চাইনা—শুনতে চাই, মানুষের কি রকম ভাবে বাঁচা উচিত।

হাঁ, তাইতো—লাল-চুলওয়ালা একটি লোক সায় দিলো।

ইয়াকোভ প্রতিবাদ ক'রে বললো, যদি আমাদের সামনে এগোতে হয়, তবে আমাদের সব-কিছু জানতে হবে।

নিশ্চয়ই—কোঁকরাচুলওয়ালা একজন ইয়াকোভকে সমর্থন করলো।

পলকে বিষম তর্কাতর্কি শুরু হ'ল, কিন্তু অশ্লীল অন্যায় ভাষা কারু মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। মা ভাবলেন, ওই মেয়েটি আছে ব'লেই ওরা সামলে চলছে।

সহসা স্থাটাশা ব'লে উঠলো, থামো, শোনো ভাইসব।

পলকে সবাই নিরব, স্থাটাশার দিকে নিবদ্ধ চক্ষু।

স্থাটাশা বললো, যারা বলে আমাদের সব-কিছুই জানা উচিত, তারাই ঠিক বলছে। যুক্তির দীপ-শিখায় চলার-পথ আলোকিত ক'রে নিতে হ'বে আমাদের—অন্ধকারে যারা আছে, তারা যাতে আমাদের দেখতে পায়। প্রতে,কটি প্রশ্নের সাধু এবং সত্য জবাব দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের থাকা চাই। যা-কিছু সত্য এবং যা-কিছু মিথ্যা, সবার সংগেই আমাদের পরিচয় থাকা দরকার।

স্থাটাশা চুপ করলে পেভেল উঠে বললো, আমাদের একমাত্র কাম্য কি পেট বোঝাই করা?

তারপর নিজেই জবাব দিলো, না। আমরা চাই মানুষ হ'তে। যারা আমাদের ঘাড়ে চেপে ব'সে আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছে, তাদের আমরা দেখাবো,—আমরা সব দেখি, আমরা বোকা নই, পশু নই, শুধু আহার করিতে চাই না,—আমরা বাঁচতে চাই মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে। আমাদের শত্রুদের আমরা দেখাব যে, বাইরে আমরা কুলি-মজুর, শ্রমদাস যা' হই না কেন, বুদ্ধি-বৃত্তিতে আমরা তাদের সমান, আর প্রাণ-শক্তিতে, তেজে, বীর্যে আমরা তাদের চাইতেও ঢের বেশি শ্রেষ্ঠ।

মার বুক ছেলের বাগ্মীতায় স্ফীত হ'য়ে উঠলো।

এণ্ড্রি বললো, দেশে আজ ভুঁড়ির ছড়াছড়ি, সাধুলোকেরই আকাল। এই পচা জীবনের জলাভূমি থেকে এক সেতু গড়ে আমাদের যাত্রা করতে

হবে মংগলময় ভাবষ্যৎ অভিমুখে। বন্ধুগণ, এই আমাদের ব্রত,—এই আমাদের করতে হবে।

দুপুর রাতে মজলিশ ভাঙলো, যে যার ঘরে চ'লে গেলো।

মা বললেন, এণ্ড্রি লোকটি কিন্তু বেশ। আর ওই মেয়েটি, কে ও?

জনৈক শিক্ষয়িত্রী।

আহা হা, কাপড়চোপড় একদম নেই, ঠাণ্ডা লাগবে যে। ওর আপনার জনেরা কোথায়?

মস্কোতে। ওর বাবা বড়লোক, লোহার কারবার, মেলাই টাকা। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই দলে ভিড়েছে ব'লে। বড়লোকের আদরিনী মেয়ে, সুখ-সম্পদে লালিত। যা' চাইত তা' পেতো, কিন্তু আজ সেই একা অন্ধকার রাতে পায়ে হেঁটে চার মাইল পথ চ'লে যায়।

মার প্রাণ পলকে ভারি হয়ে উঠলো, বললেন, শহরে যাচ্ছে?

হাঁ।

ভয় করে না ওর?

না।

কেন গেলো? এখানে তো থাকতে পারতো, আমার সংগে শুতো।

তা' হয় না। কাল সকালে উঠে সবাই দেখতো। আমরা তা' চাই না, ও-ও চায় না।

মার মনে সেই আগেকার উদ্বেগ জেগে উঠলো, বললেন, কিন্তু আমিতো বুঝতে পাচ্ছিনা পেভেল, এর ভেতর বিপজ্জনক বা অন্যায় কি আছে? তোরা তো আর খারাপ-কিছু কচ্ছিস না।

শান্তভাবে মায়ের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে পেভেল জবাব দিল, আমরা

যা' করছি, তাতে খারাপ কিছু নেই, খারাপ-কিছু থাকবেও না; কিন্তু তবু আমাদের জেলে যেতে হ'বে তুমি তো এসব জানো মা!

মার হাত কেঁপে উঠলো। বসা গলায় তিনি বললেন, ভগবান তোমাদের যে ক'রেই হ'ক রক্ষা করবেনই।

না মা, তোমায় আমি মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারি না; রক্ষা আমরা কিছুতেই পাবো না।

মাকে শুতে ব'লে ছেলে চ'লে গেলো নিজের কামরায়।

মা একা জানালার কাছটিতে এসে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। তুষারে-ছাওয়া পথ, ঝড়ো-হাওয়ার অবিরাম মাতামাতি তারপরেই একটা খোলা মাঠ শাদা তুষাররাশি, তার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শিমুল তুলোর মতো ঘন ধারায় বাতাস প্রলয়-বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে মা দেখলেন, তারই মধ্য দিয়ে একা চলেছে স্যাটাশা তার পোশাক বাতাসে দাপাদাপি করছে, পা ব'সে যাচ্ছে, মুখে-চোখে কে যেন মুঠো মুঠো তুষার ছুড়ে মারছে—স্যাটাশা এগোতে পারছে না, ঝড়ের মুখে একগাছি কুশের মতো সে নুয়ে পথ বয়ে চলেছে। ডানে তার কৃষ্ণাভ অরণ্য-প্রাচীর, নগ্ন পত্রহীন গাছগুলি যেন বাতাসে ব্যথিত হ'য়ে আর্তনাদে চারদিক পূর্ণ ক'রে তুলেছে। দূরে শহরের আলোর ক্ষীণাতিক্ষীণ আলো।

কী এক অভূতপূর্ব আতংকে শিউরে উঠে' মা ঊর্ধ্বে চেয়ে প্রার্থনা জানালেন, ভগবান, রক্ষা করো।

চার

এমনি ক'রে দিন কাটে। ফি শনিবারে দলের লোকেরা পেভেলের বাড়িতে এসে মজলিশ করে আর এক-এক ধাপ ওপরে ওঠে কিন্তু কোথায়, কতদূরে গিয়ে এ সিঁড়ি শেষ হয়েছে, কেউ তা' জানে না। রোজ নয়া-নয়া লোক আসে, পেভেলের কামরায় আর তিলধারণের স্থান থাকেনা। ন্যাটাশাও আসে · · তেমনি শ্রান্ত ক্লান্ত, কিন্তু যৌবনমদে তেমনি জীবন্ত, পরিপূর্ণ। মা তার জন্ত মোজা বোনেন, নিজের হাতে তার পায়ে পরিয়ে দিয়ে মাতৃস্নেহে তাকে অভিষিক্ত করেন। ন্যাটাশা প্রথমটা হাসে, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে কি ভাবে। স্নিগ্ধ ধীর কণ্ঠে মাকে বলে, আমার এক ধাই সেও আমায় এমনি ভালবাসতো কা আশ্চর্য মা, কুলি-মজুরের এই তো দুঃখ-সংকুল অত্যাচারিত জীবন তবু তাদের মাঝে যেটুকু প্রাণ আছে, যতটুকু সাধুতা আছে, তা' ওদের মধ্যে নেই—ব'লে হাত তু'লে সে দূরদূরা-এর কাদের নির্দেশ করে।

মা বললেন, কিন্তু মা, কেন তুমি নিজের আত্মীয়স্বজন সুখ-সাধ সব ত্যাগ করে এসেছো?

ম্লান হাস্তে ন্যাটাশা বলে, আত্মীয়স্বজন সুখ-সাধ—কিছু নয় মা। শুধু মার কথা ভেবে কষ্ট হয় তোমারই মতো সে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তাঁকে দেখি।

মা মাথা নেড়ে দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, আহা, বাছা আমার!

ন্যাটাশা কিন্তু জবাবে খিলখিল করে হেসে ওঠে, বলে, না মা, দুঃখ কোথায়! মাঝে মাঝে এতো আনন্দ, এতো সুখ আমি পাই · বলতে বলতে

তার মুখ প্রশান্ত হয়, তার নীল চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মার কাঁধে হাত রেখে স্বপ্নাবিষ্টের মতো শান্ত, আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় বলে, যদি জানতে মা, যদি বুঝতে কী মহান, কী আনন্দময় কাজ আমরা ক'রে যাচ্ছি! একদিন বুঝবে।

মার যেন ঈর্ষা হয় স্তাটাশার ওপর, বলেন, আমি বুড়ো, বোকা, কি-ইবা বুঝি।

পেভেলের বক্তৃতা ক্রমশ বাড়ে। আলোচনার সুর ক্রমশ চড়তে থাকে, আর তার শরীর হয় ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। সে যখন স্তাটাশার সংগে কথা কয়, মা দেখেন যেন তার কণ্ঠ মধুর, তার দৃষ্টি কোমল, তার সমস্ত চেহারা সহজ সরল হ'য়ে আসে। স্তাটাশাকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা ক'রে মা অন্তরে অন্তরে পুলকিত হ'য়ে ভগবানকে বলেন, তাই করো ঠাকুর।

আলোচনার সুর যখন সপ্তমে ওঠে, এণ্ড্রি সটান দাঁড়িয়ে তাদের কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তর্কাতর্কি বাধাবার প্রধান পাণ্ডা নিকোলাই। তার দলে শাময়-লোভ, আইভান বুকিন এবং ফেদিয়া মেজিন। ইয়াকোভ, পেভেল, এণ্ড্রি অন্য দলে।

মাঝে মাঝে স্তাটাশার বদলে আসেন অ্যালেক্সি আইভানোভিচ্। তার আলোচ্য বিষয় অতি সাধারণ—পারিবারিক জীবন-যাত্রা, ছেলেপিলে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ, রুটি ও মাংসের দাম, এইসব প্রত্যেকটা জিনিসে তিনি দেখতে পান জাল-জুয়াচুরি, বিশৃংখলা, বোকামি· মাঝে মাঝে তা' নিয়ে ঠাট্টাও করেন, কিন্তু সব সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখান মানুষের জীবন এসবের ফলে কতো অসহজ এবং অসুবিধাপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর একটি মেয়েও প্রায়ই আসে শহর থেকে। নাম তার শাশেংকা।

লম্বা সুগঠিত দেহ, পাতলা গম্ভীর মুখ, সমস্ত অংগ দিয়ে যেন একটা তেজ ফুটে বেরুচ্ছে, কী এক অজ্ঞাত রোষে যেন তার কালো ভুরু কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। যখন কথা বলে, পাতলা নাকের পাতা কাঁপতে থাকে, সে-ই প্রথম উচ্চারণ করলো, আমরা সোশিয়ালিস্ট। রুদ্র, রুক্ষ তার কণ্ঠ।

মা শুনেই নির্বাক আতংকে মেয়েটির দিকে চাইলেন, কিন্তু শশেংকা চক্ষু অর্ধ-মুদ্রিত ক'রে দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে বললো, এই নবজীবন গঠন ব্রতে আমাদের সমগ্র শক্তি দান করতে হবে,—আর আমাদের একথাটা বুঝতে হবে যে, এ দানের কোনো প্রতিদান আমরা পাবো না।

সোশিয়ালিস্ট কথাটার সংগে মা পরিচিত। বাল্যে গল্প শুনতেন, চাষাদের দাসত্ব হ'তে মুক্ত ক'রে দেওয়ায় জমিদাররা জারের ওপর রেগে গিয়ে পণ করেন, জারের মুণ্ডচ্ছেদ না ক'রে চুল ছাঁটব না। এরাই নাকি সোশিয়ালিস্ট, এরাই তখন জারকে খুন করে। তবে? তার ছেলে এবং এরা সব সেই সোশিয়ালিস্ট হ'ল কি ক'রে?

সব চ'লে গেলে ছেলেকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, হাঁরে, তুই কি সোশিয়ালিস্ট?

হাঁ—কেন বলোতো মা?

দীর্ঘনিশ্বাসের সংগে চোখ নামিয়ে মা বললেন, পাভ্লুশা, তোরা জারের বিরুদ্ধে কেন? একজন জারকে তারা খুন করেছিলো।

পেভেল পাইচারি করতে করতে হেসে বললো, কিন্তু আমরা ও করতে চাই না মা। মাকে বহুক্ষণ ধরে সে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বোঝালো। মা তার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, পেভেল কোনো খারাপ কাজ করবে না—করতে পারে না।

কিন্তু শশেংকার ওপর মা তেমন খুশি নন। কথাপ্রসংগে এণ্ড্রিকে

একদিন বললেন, শশেংকা কি কড়া মেয়ে বাবা। খালি হুকুম, এ করো, ও করো।

এণ্ড্রি হেসে বললে, তুমি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছ মা।

পেভেল নিরস কণ্ঠে বললো, কিন্তু সে মেয়ে ভালো।

এণ্ড্রি বললো, একশোবার শুধু সে এইটে বোঝে না যে

তারপরেই দু'জনের মধ্যে যে তর্কাতর্কি শুরু হল, মা তার খেই ধরতে পারলেন না।

মা লক্ষ্য করতেন, শশেংকা পেভেলের সংগে এত রূঢ় ব্যবহার করে, এমনকি মাঝে মাঝে তিরস্কার করে, তবু পেভেল কিছু বলে না, চুপ ক'রে থাকে, হাসে, ছাটাশার দিকে যেমন ক'রে চাইতো তেমনি ক'রে তার দিকে চায়। এটা মা সইতে পারতেন না।

মজলিশের বৈঠক ঘন ঘন, হপ্তায় দু'দিন ক'রে চলতে লাগলো। নতুন নতুন গানের আমদানি হ'ল সুরের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুতে লাগলো এক দমনীয় শক্তি। নিকোলাই গম্ভীরভাবে বলতো, এবার রাস্তায় বেরিয়ে এ গান গাইবার সময় এসেছে।

মাঝে মাঝে তারা আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে বিদেশী শ্রমিক ভাইদের জয়-যাত্রার সংবাদে; তাদের নামে জয়ধ্বনি করে, তাদের অভিনন্দিত ক'রে চিঠি পাঠায়, দুনিয়ার যেখানে যত শ্রমিক আছে, তাদের সংগে নিজেদের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ মনে করে, তাদের সংগে আত্মীয়তা স্থাপন করে।

মার চিত্তও ধীরে ধীরে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। এণ্ড্রিকে সম্বোধন ক'রে একদিন তিনি বলেন, কী মজার লোক তোমরা! কোথাকার কোন্ আর্মেনিয়ান, ইহুদী অষ্ট্রিয়ান সব তোমাদের ভাউাৎ সবাইকে বলো তোমরা বন্ধু, সবার জন্য দুঃখ করো, সবার সুখে উৎফুল্ল হও।

এণ্ড্রি বললো, সবার জন্তই আমরা দাঁড়িয়েছি মা। এই দুনিয়াটা আমাদের শ্রমিকদের···আমাদের কাছে কোনো জাতি নেই, কোনো বর্ণ নেই—আমাদের কাছে আছে শুধু মিত্র এবং শত্রু। দুনিয়ার নিখিল শ্রমিক আমাদের স্তাঙাৎ। ধনী এবং কর্তার দল আমাদের দুশমন। দুনিয়ার দিকে চেয়ে যখন দেখি, শ্রমিক আমরা কতো অসংখ্য, কী বিপুল আমাদের প্রাণ-শক্তি, তখন হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে, সুখে উদ্বেল হয়, বুকের মধ্যে উৎসবের বাঁশি বাজতে থাকে। ঐ ফরাসী শ্রমিক, জার্মান শ্রমিক, ইতালিয়ান শ্রমিক জীবনের দিকে যখন চায় ওরাও এমনি ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। একই মায়ের সন্ততি আমরা, বিশ্বের সকল দেশের সকল শ্রমিকের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আমাদের নবজন্ম। এই বন্ধন ক্রমশ প্রবল হচ্ছে, সূর্যের মতো আমাদের দীপ্ত ক'রে তুলছে—এ যেন স্থায় গগনে সমুদিত নবসূর্য এবং এ গগন শ্রমিক-হৃদয়েরই অভ্যন্তরে। সে যেই হ'ক, যা-ই তার নাম হ'ক, সোশিয়ালিস্ট মাত্রেই আমাদের ভাই—আজ, চিরদিন, যুগ-যুগান্তর ধ'রে।

মা তাদের শক্তি-দীপ্ত আননের দিকে চেয়ে অনুভব করেন, সত্যিসত্যিই বিশ্বাকাশে তার চোখের আড়ালে এক নব দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতির আবির্ভাব হয়েছে আকাশের সূর্য্যের মতোই যা মহান।

এমনি ক'রে তাদের চাঞ্চল্য বেড়ে চলে। পেভেল মাঝে মাঝে বলে, একটা কাগজ বের করা দরকার।

নিকোলাই বলে, আমাদের নিয়ে কানা-ঘুষো চলছে পাড়ায়। এখন সরে পড়া ভালো।

এণ্ড্রি জবাব দেয়, কেন এতো ধরা পড়ার ভয়!

মা এণ্ড্রিকে ভালোবেসে ফেলেছেন নিজের ছেলের মতো। কাজেই তিনি একদিন প্রস্তাব করলেন পেভেলের কাছে, এণ্ড্রি এখানেই থাকুক

না, তাহ'লে আর তোদের আর ওর বাড়ি ছুটাছুটি ক'রে হয়রান হ'তে হয় না।

পেভেল বললে, ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ কি মা।

ঝঞ্ঝাট· তাতো চিরটা জনমই পুইয়ে এসেছি অমন ভালো ছেলের জন্ম পোহানো তো বরঞ্চ সার্থক !

পেভেল বললো, তাই হ'ক মা, এণ্ড্রি এলে আমি সুখীই হ'ব।

কাজেই এণ্ডি এসে মার আর একটি ছেলে হ'য়ে বসলো।

পাঁচ

নিকোলাই কিছু মিথ্যা বলেনি,—পেভেলের বাড়িটা সমস্ত পল্লির ভীতি, আতংক এবং সন্দেহের কেন্দ্র হ'য়ে পড়লো। চারপাশে সময়ে-অসময়ে নানা প্রকৃতির লোক নিঃশব্দে ঘু'রে বেড়ায়—বাড়ির গোপন রহস্য ভেদ করবে ব'লে। তাড়িখানার মালিক বুড়ো একদিন মাকে পথে পেয়ে বল'লা, কেমন আছো গো ? তোমার ছেলের খবর কি ? বিয়ে দিচ্ছ না কেন ? বিয়ে দিয়ে দিলেই তোমাদের পক্ষে মংগল। আর বিয়ে হলে মানুষও সামাল থাকে। আমি হ'লে কবে বিয়ে দিয়ে দিতুম। কী দিন-কাল পড়েছে বোঝতো 'মানুষ' নামধেয় পশুটির ওপর এখন কড়া নজর রাখা দরকার,—মানুষ এখন মগজ খাটিয়ে বাঁচতে চায়, চিন্তা ক'রে ক'রে তারা উচ্ছৃংখল হ'য়ে উঠেছে, এমন সব কাজ করছে, যা' দস্তুরমতো অন্যায়। গির্জায় যায় না, মেলায় মহোৎসবে যোগ দেয়না, খালি আনাচে-কানাচে ব'সে দল পাকায় আর ফিস-ফাস করে। এতো ফিস-ফাস কেন বাপু ?

ফিস-ফাস না ক'রে খোলাখুলি তাড়িখানার লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলুক না—সে সাহস নেই। আমি জানতে চাই, কি এ? গোপনীয়? গোপনীয় স্থান একমাত্র পবিত্র গির্জা—অন্য সব কোথায়ও ব'সে কানাঘুষ-ঘুষি ভ্রান্তি, মায়া, বুঝলে·

লম্বা বক্তৃতা শেষ ক'রে বুড়ো চলে গেলো। মা বিব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপরে সাবধান করে গেলো এক পড়শী বুড়ি। মা বাড়ি এসে ছেলেদের সব খুলে বললেন—তোরা বিয়ে করছিস না, মদ খাচ্ছিস না অথচ সন্দেহজনক মেয়েদের সংগে মিশছিস তাই পাড়ার সব, বিশেষত মেয়েরাও তোদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

পেভেল বিরক্ত হ'য়ে বললো, বেশ যাক।

এণ্ড্রি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললো, আস্তকুঁড়ে সব-কিছুতেই পচা গন্ধ। বোকা মেয়েগুলোকে তুমি কেন বুঝিয়ে দিলে না মা, যে—বিয়ে কী চিজ। তা'হলে তারা হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দেবার জন্য এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠতো না।

মা বললেন, তারা সবই দেখে বাবা, সবই জানে, জানে তাদের ভবিষ্যত কতো দুঃখময়। কিন্তু কি করতে পারে তারা? আর কোন পথ নেই তাদের।

পেভেল বললো, বুদ্ধিই তাদের মোটা, নইলে পথ তারা খুঁজে পেতো।

মা বললেন, তোরাই কেন তাদের বুদ্ধি শোধরাস না বাবা? বুদ্ধিমতী যারা তাদের ডেকে দুটো কথা বলনা।

কিছু হ'বে না তা'তে—পেভেল জবাব দিলো।

এণ্ড্রি বললো, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রেই দেখা যাকনা।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পেভেল বললো, হাঁ, আজ কাজের নাম ক'রে

মেয়েদের সংগে মিশবে, কাল হাত-ধরাধরি ক'রে জোড়ায় জোড়ায় বেড়াবে, তারপর হবে বিয়ে। বাস সব শেষ জীবনের।

মা ছেলের এই বিবাহ-বিমুখতায় চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন।

একদিন মা শুয়েছেন ঘুমুবেন ব'লে ও কামরায় এণ্ড্রি পেভেল কি কথা বলছে, শুনতে পেলেন।

এণ্ড্রি বলছে, তুমি জানো ন্যাটাশাকে আমি পছন্দ করি?

জানি।

ন্যাটাশা কি এটা লক্ষ্য করেছে?

পেভেল নিরুত্তরে ভাবতে লাগল। এণ্ড্রি স্বর আরো নিচু ক'রে বললো, কি মনে হয় তোমার?

লক্ষ্য করেছে, আর সেইজন্যই সে মজলিশে আসা ছে'ড় দিয়েছে।

এণ্ড্রি নিরব উদ্বেগে খানিকক্ষণ পায়চারি করে বললো, যদি আমি তাকে একথা বলি?

কি কথা? বন্দুকের গুলির মতো পেভেলের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়লো।

চাপা গলায় এণ্ড্রি বললো—যে আমি ।

পেভেল বাধা দিয়ে বললো, কেন?

এণ্ড্রি বাধা পেয়ে মুহূর্তেক স্তব্ধ থেকে একটু হেসে বললো, দেখো বন্ধু, কোনো মেয়েকে যদি তুমি ভালবাসো, তাকে সেটা বলা চাই; নইলে ভালোবাসাটাই বৃথা।

সশব্দে পাঠ্য বইখানা বন্ধ ক'রে পেভেল বললো, কিন্তু তাতে ফয়দা হ'বে কি বলতে পারো?

অর্থাৎ? এণ্ড্রি জিজ্ঞাসু নয়নে পেভেলের দিকে চাইলো।



পেভেল ধীরে ধীরে বললো, এণ্ড্রি, কি তুমি করতে যাচ্ছ, সে সম্বন্ধে তোমার মনে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। ধরে নিলুম, সেও তোমাকে ভালোবাসে, যদিও আমি তা' বিশ্বাস করিনা, তবু ধ'রে নেওয়া গেলো। তারপর বিয়ে হ'ল। চমৎকার মিলন—পণ্ডিতের সঙ্গে মজুরানির সংযোগ। তারপর এলো পুত্রকন্যার বন্যা পরিবারের জন্যই তোমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে সংসারের শতকরা নিরানব্বুই জন যেমন ক'রে জীবন কাটায়, তোমারও তেমনি কাটবে। তোমাদের এবং ছেলেমেয়েদের জন্য আহারের রুটি এবং বাসের কুটিরের সংস্থান করতে জীবন কাটাবে। যে ব্রত নিয়ে আমরা নেবেছি, তার পক্ষে তোমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না—তোমার এবং ন্যাটাশার।

এণ্ড্রি চুপ ক'রে রইলো। পেভেল এবার সুর নরম করে বললো, এসব ছেড়ে দাও এণ্ড্রি। একটা মেয়েকে নিয়ে মজে যেয়োনা, স্থির হও,—এই হচ্ছে একমাত্র শ্রেয় পথ।

এণ্ড্রি বললো, কিন্তু আলেক্সি আইভানোভিচ কি বলেছিলেন মনে আছে? মানুষকে পরিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হবে· দেহের এবং আত্মার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে,—মনে আছে পেভেল!

পেভেল সোজা জবাব দিলো, সে আমাদের জন্য নয় এণ্ড্রি। পরিপূর্ণতা কি ক'রে লাভ করবে তুমি তা যে তোমার নাগালের বাইরে। এণ্ড্রি, যদি ভবিষ্যৎকে ভালোবাসো, ভবিষ্যৎকে চাও, তবে বর্তমানের সব-কিছু তোমায় ত্যাগ করতে হ'বে—সব-কিছু।

মানুষের পক্ষে তা' শক্ত—এণ্ড্রি বললো।

কিন্তু আর কি করার আছে? ভেবে দেখো।

এণ্ড্রি আবার চুপ ঘড়ির টিক টিক শব্দে যেন জীবন থেকে এক-একটা

মুহূর্ত কেটে নিচ্ছে। · শেষে এণ্ড্রির কথা ফুটলো, আদ্দেক প্রাণ বাসে ভালো, আদ্দেক করে ঘৃণা। এই কি প্রাণ?

আমি জিগ্যেস করি, তোমার আর কি করার আছে? ব'লে পেভেল বইর পাতা উলটাতে লাগলো।

তাহ'লে আমায় চুপ করে থাকতে হবে?

হাঁ, তাই উচিত।

বেশ, তাই হ'বে। এই পথেই চলবো আমরা, কিন্তু পেভেল তোমার যখন এদিন আসবে তখন তোমার পক্ষে শক্ত হ'বে এ আদর্শ।

শক্ত এখনই হয়েছে, এণ্ড্রি।

বলো কি।

হাঁ।

এণ্ড্রি চুপ করে গেলো, বুঝলো পেভেলও কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছে, —কিন্তু ব্রতের খাতিরে প্রেমকে সে দমন ক'রে রেখেছে। পেভেল যা' পেরেছে, সে কেন তা' পারবে না! নিশ্চয়ই পারবে।

* * * *

পল্লিময় হুলুস্থূল—সোশিয়ালিস্টরা লাল-কালিতে ছাপা ইস্তাহার ছড়াচ্ছে মজুরদের মধ্যে। তাতে কারখানার মজুরদের শোচনীয় অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো ক'রে লেখা, কোথায় কোন্ ধর্মঘট হচ্ছে, তার ফিরিস্তি,—সর্বশেষে মজুরদের সংঘবদ্ধ হ'য়ে স্বার্থরক্ষাকল্পে লড়াই করার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ আবেদন।

মোটা মাইনে যারা পায়, তারা সোশিয়ালিস্টদের গাল দিয়ে ইস্তাহার নিয়ে কর্তাদের কাছে জমা দেয়। তরুণরা সাগ্রহে প্রত্যেকটি কথা গেলে, উত্তেজনায় চঞ্চল হ'য়ে বলে, সত্যিই তো তাই। কিন্তু বেশির ভাগই শ্রমক্লান্ত

· ·নিরাশ-হৃদয় । ঘাড় নেড়ে বলে, হুজুগ, হুজুগ ওতে কিছু হ'বে না, হবার জো নেই। যে যা' বলুক, সবার প্রাণেই কিন্তু একটা চাঞ্চল্য একদিন যদি দেরি হ'ল ইস্তাহার বের হ'তে অমনি আলোচনা, আজো বেরুলোনা, ছাপা বন্ধ হ'য়ে গেলো বুঝি! তারপর সোমবারে ইস্তাহার বেরোলে আবার আন্দোলন।

মা জানতেন, এসবের মূলে তাঁরই ছেলে। তাঁর আনন্দও হ'ত, শংকাও হ'ত। একদিন সন্ধ্যায় এসে সেই পড়্শী বুড়ি খবর দিয়ে গেলো, নাও এইবার ঠেলা সাম্লাও; আজ রাতেই পুলিশ আসছে, তোমাদের বাড়ি আর নিকোলাইদের বাড়ি, আর মেজিনদের বাড়ি

মা ধপ ক'রে চেয়ারে ব'সে পড়লেন,—তাঁর মাথা ঘুরছে, সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু ছেলের আসন্ন বিপদের কথা মনে পড়তেই সাহসে তাঁকে বুক বেঁধে ওঠতে হ'ল। প্রথমেই তিনি মেজিনকে খবরটা দিয়ে এলেন,—মেজিন ব'লে দিলো, তুমি যাও মা, ওদের আমি খবর পাঠাচ্ছি। পুলিশ বেড়ায় ডালে ডালে, আমরা বেড়াই পাতায় পাতায়।

মা বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত কাগজপত্র বই বুকে গুঁজে অস্থিরভাবে পাইচারি করতে লাগলেন মনে করলেন, পেভেল এখুনি কাজ ফেলে ছুটে বাড়ি আসবে। কিন্তু পেভেল এলো না। মা অবসন্ন হ'য়ে রান্নাঘরের বেঞ্চের ওপর ব'সে রইলেন পেভেল ও এণ্ড্রি কারখানা হ'তে ফিরে এলো মা তখনো সেই অবস্থার ব'সে, জিগ্যেস করলেন, জানো সব?

হাঁ। তোমার কি ভয় হচ্ছে মা?—পেভেল জিগ্যেস করলো।

এণ্ড্রি বললো, ভয় ক'রে লাভ কি? ভয় করলে কি বিপদ উদ্ধার হয়? হয় না, তবে?

পেভেল বললো, উনুনটিও বুঝি ধরাওনি মা!

মা বইগুলি চেপে বসেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তা' দেখিয়ে বললেন, ঐগুলো নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম, সারাক্ষণ

এণ্ড্রি-পেভেল হেসে উঠলো মা যেন এতে আশ্বস্ত হলেন। পেভেল খানকয়েক বই বেছে নিয়ে উঠানে নিয়ে লুকিয়ে রাখলো। এণ্ড্রি মাকে সাহস দেবার জন্ম গল্প জুড়ে দিলো, কিছু ভয় নেই মা। ওদের জন্ম আমার আপসোস হয় মা, ইয়া হোমরা চোমরা প্রবীণ অফিসার, তলোয়ার ঝুলিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কাজটা কি করেন? এ কোন খোঁজেন, ও কোন খোঁজেন, বিছানাটা ওলটান, মুখে কালি-ঝুল মাখেন তারপর বিজয়ী বীরের মতো চ'লে যান। একবার ওদের পাল্লায় পড়েছিলুম, মা। জিনিসপত্র তছনছ ক'রে আমায় ধ'রে নিয়ে গেলো। তারপর জেলে রাখলো চার মাস। সে কী জীবন কেবল ব'সে থাকা আলসে হ'য়ে তারপর ডেকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলো। দু'দিকে পাহারা আদালতে গেলুম যা'তা জিগ্যেস করলো তারপর আবার জেলে পাঠালো। তারপর এ জেল থেকে সে জেল, এখান থেকে সেখানে। এমনি ধারা। কি করবে? মাইনে খায়, বেচারীদের যা' হ'ক একটা কিছু ক'রে দেখাতে হ'বে তো।

মার মনে যতটুকু ভয় জমে উঠেছিল, তা' নিঃশেষে মিলিয়ে গেলো।

ছয়

পুলিশ এলো একমাস পরে অপ্রত্যাশিতভাবে। দুপুর রাত। নিকোলাই, এণ্ডি, পেভেল গল্প করছে মা অর্ধ-নিদ্রিতা

এণ্ডি কি কাজে রান্নাঘরে গিয়েই হঠাৎ ফিরে এলো ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে, পুলিশের সাড়া পাচ্ছি।

মা বিছানা থেকে উঠে পড়লেন কাঁপতে কাঁপতে। পেভেল মাকে শুইয়ে দিয়ে বললো, শুয়ে থাকো মা, তুমি অসুস্থ।

স্থানীয় চৌকিদার ফেদিয়াকিনকে সংগে ক'রে পুলিশের এক কর্তা এসে ঢুকলেন। মাকে দেখিয়ে পেভেলের দিকে চেয়ে ফেদিয়াকিন বললো, এই হুজুর ওর মা—আর ঐ হ'ল পেভেল।

কর্তা গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, তুমি পেভেল ভ্লাসভ?

হাঁ।

তোমার বাড়ি খানাতল্লাস করব। এই বুড়ি, ওঠ্।

হঠাৎ কি একটা শব্দে সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্তা পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন, কে তুমি? নাম কি তোমার?

তারপর খানাতল্লাশী চললো জিনিসপত্রগুলো তছনছ ক'রে বইগুলো খুশিমতো এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলে। এ অন্যায় অত্যাচার আর সইতে না পেরে নিকোলাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠলো, বইগুলো মেজের ওপর ছুঁড়ে ফেলার কি দরকার?

মা নিকোলাইর সাহস দেখে বিস্মিত, তার পরিণাম ভেবে শংকিত হ'য়ে

উঠলেন। কর্তা রক্তচোখে নিকোলাইর দিকে চাইতে লাগলেন। মা পেভেলকে বললেন, নিকোলাই চুপ থাকুক না কেন!

কর্তা ধমক দিয়ে বললেন, কি কথা হচ্ছে! চুপ · এ বাইবেল পড়ে কে?

পেভেল বললো, আমি।

এসব বই কার?

আমার।

তখন নিকোলাইর দিকে ফিরে বললেন, তুমিই বুঝি এণ্ড্রি?

হাঁ।

পরক্ষণেই এণ্ড্রি তাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এসে বললো, ও নয়, আমি এণ্ড্রি!

কর্তা নিকোলাইর দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললেন, হুশিয়ার। তারপর পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের ক'রে ঘেঁটে এণ্ড্রিকে বললেন, এণ্ড্রি, রাজনৈতিক অপরাধে এর আগেও তোমার খানাতল্লাশ হয়েছিল?

হাঁ, রস্টোভ এবং সারাটোভে। তবে সেখানকার পুলিশের ভদ্রতা জ্ঞান ছিল। আমার নামের আগে মিস্টার যোগ দিতে অবহেলা করেনি।

কর্তা ডান চোখ কুঁচকে, রগড়ে; চক্চকে শাদা দাঁতগুলি বের ক'রে বললেন, তা', মিস্টার এণ্ড্রি, তুমি কি জানো কোন্ বদমাইশরা এই বে-আইনী ইস্তাহার আর বই বিলি ক'রে বেড়ায়?

এণ্ড্রি জবাব দেবার আগেই নিকোলাই ব'লে উঠলো, বদমাইশ এই আমরা প্রথম দেখছি এখানে।

কর্তা হুকুম করলেন, শূয়োরকে নিয়ে যাও এখান থেকে।

দু'জন সৈনিক নিকোলাইকে বে'র ক'রে নিয়ে গেলো। খানাতল্লাশ

শেষ ক'লে কর্তা বললেন, মিস্টার এণ্ডি_ নাখোদ্‌কা, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করনুম।

কি অপরাধে?

পরে বলব। তারপর মার দিকে চেয়ে বললেন, লিখতে পড়তে জানো বুড়ি?

জবাব দিল পেভেল, না।

কর্তা ধমক দিয়ে বললেন, তোমায় কে জিগ্যেস করেছে! বুড়ি বলবে।

মার মনে রি-রি করে উঠলো একটা অপরিসীম ঘৃণা। কর্তার মুখের সামনে হাত নাচিয়ে বললেন, চেঁচিওনা, এখনো তুমি বড় হওনি। জানো না, কী দুঃখ, কী বেদনা

পেভেল বললো, স্থির হও মা।

এণ্ডি_ বললো, বুকের ব্যথা দাঁত দিয়ে চেপে থাকা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই, মা।

মা সেকথা কানে তুললেন না, চেঁচিয়ে উঠলেন,/কেন তোমরা এমন ক'রে মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও?

কর্তাও চড়া সুরে জবাব দিলেন, সে জবাব তুমি চাইতে পারোনা। চুপ কর

মা ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো ফুলতে লাগলেন।

কর্তা তখন হুকুম দিলেন, নিকোলাইকে হাজির কর।

সৈন্যরা দু'জনে দু'হাত ধরে নিকোলাইকে নিয়ে এলো। নিকোলাইর মাথায় টুপি কি একটা দলিল পড়তে পড়তে কর্তার সেটা খেয়াল হ'ল। পড়া বন্ধ ক'রে তিনি গর্জে উঠলেন, টুপি নাবাও

নিকোলাই একটু রসিকতা ক'রে বললো, আজ্ঞে হুজুর, আমার তো

একখানা তৃতীয় হাত নেই যে আপনার হুকুম তামিল করব। দেখছেন দু'জনে দু'হাত ধ'রে।

কর্তা একটু অপ্রস্তুত হ'লেন। তারপর নিকোলাই এবং এণ্ড্রিকে ধ'রে নিয়ে চলে গেলেন।

পেভেল বন্ধুদের হাসিমুখে বিদায় দিলো, আবেগে বলে উঠলো, আগে, নিকোলে ভাই।

তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, পুলিশ দু'জনকে ধ'রে তাকে যে ছুঁলোওনা, এ তাকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই না। তাকে কেন এই সংগে ধ'রে নিয়ে গেলোনা!

মা সান্ত্বনার সুরে বললেন, নেবে বাবা, নেবে—দু'দিন সবুর কর।

পেভেল বললো, সত্যিই নেবে মা।

মা ব্যথিত হ'য়ে বললেন, তুই কি নিষ্ঠুর পেভেল। একবারও যদি প্রবোধ দিস। আমি একটা আশংকার কথা বললে, তুই বলিস তার চাইতেও ভয়ংকর কিছু।

পেভেল মার দিকে চাইলো, তাঁর কাছটিতে এগিয়ে এলো; তারপর ধীরে ধীরে বললো, আমি যে পারি না মা, তোমায় মিথ্যা প্রবোধ দিতে পারি না· তোমার যে সব সইতে হ'বে, সব শিখতে হ'বে, মা।

সাত

পরদিন জানা গেলো বুকিন, ভাসোয়লোভ, শেমোভ এবং আরো পাঁচজন ধরা পড়েছে। ফেদিয়া মেজিন এসে সগর্বে খবর দিয়ে গেলো, তার বাড়িও খানাতল্লাশ হয়েছে, তবে তাকে ধরেনি।

মিনিট কয়েক পরে প্রতিবেশী রাইবিন এলেন। রাইবিন বৃদ্ধ, বহুদর্শী এবং তথাকথিত ধর্ম-পদ্ধতির ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা। পেভেলের সংগে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার আলাপ জমে উঠ্‌লো। বললেন, তোমরা মদ খাওনা, খারাপ-কিছু করনা, তাই সবাই তোমাদের সন্দেহ করে। এই-ই দুনিয়ার হাল। কর্তারা বলেন, তোমরা নাস্তিক গির্জায় যাওনা, যদিও আমিও তথৈবচ। তারপর ঐ বে-আইনী ইস্তাহারগুলি; ওগুলিও তো তোমরা ছড়াও, নয়?

হাঁ।

যা ভয়ে ভয়ে তা' ঢাকতে চায়। তারা কেবল হাসে।

রাইবিন বলে, বেশ সুচিন্তিত লেখা, লোককে মাতিয়ে তোলো। সবসুদ্ধ বারোটা বেরিয়েছে, নয়?

হাঁ।

সবগুলিই আমি পড়েছি।

তারপর কথাপ্রসংগে পেভেল অগ্নিগর্ভ ভাষায় ব্যক্ত ক'রে যেতে লাগলো, ধর্ম, রাজা, রাষ্ট্র-শাসন, কারখানা, দেশ-বিদেশের মজুর জীবন সম্বন্ধে তার অভিমত। রাইবিন হেসে বললেন, তরুণ তুমি, লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুবই কম।

পেভেল বললে'. কে তরুণ, কে বৃদ্ধ, সে কথা ছেড়ে দিন; কার চিন্তার ধারা সত্য, তাই দেখুন।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতারিত হয়েছি, এইতো? তা' আমার মত তাই। আমিও বলি, আমাদের ধর্ম মিথ্যা, ধর্ম আমাদের ক্ষতি করেছে।

মা এই নাস্তিক্য-বাদে শিউরে উঠে বললেন, ঈশ্বরের কথা যখন ওঠে একটু সতর্ক হ'য়ে কথা কয়ো। যে কাজ তোমরা করছ, তাই তোমাদের জীবনে সান্ত্বনা জোগায়, কিন্তু আমার ঈশ্বর ছাড়া যে কিছুই নেই, তাঁকে কেড়ে নিলে আমি দুঃখে কষ্টে কার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াব!

পেভেল বললো তুমি আমাদের কথা বুঝলেনা মা। যে মংগলময়. দয়াল ঈশ্বর তোমার উপাস্য, আমি তাঁর কথা বলিনি; আমি বলেছি, সেই ঈশ্বরের কথা যাকে দিয়ে পুরুতের দল আমাদের শাসিয়ে রাখে, যার দোহাই দিয়ে দুষ্টমেলোর অন্যায় ইচ্ছার সম্মুখে আমাদের মাথা নোয়াতে বাধ্য করে।

রাইবিন টেবিল চাপড়ে বললেন, ঠিক বলেছ। ওরা আমাদের ঈশ্বরকে ভেঙে চুরে ওদের কার্যোপযোগী ক'রে নিয়েছে। ওদের হাতে যা-কিছু, সব আমাদের বিরুদ্ধে। গির্জায় ঈশ্বরের আমদানি শুধু আমাদের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখার জন্য—এ ঈশ্বরকে বদলে ফেলতে হ'বে মা,—

মা ব্যথিত হ'য়ে চ'লে গেলেন সেখান থেকে।

রাইবিন পেভেলকে বললেন, দেখেছো, এর আরম্ভ কোথায়! মাথায় নয়, হৃদয়ে। আর হৃদয় এমন স্থান যে, ও ছাড়া আর কিছু জন্মায় না তাতে।

পেভেল দৃঢ়কণ্ঠে বললো, যুক্তি—একমাত্র যুক্তিই মানুষকে মুক্তি এনে দেবে।

রাইবিন বললেন, কিন্তু যুক্তি তো শক্তি দিতে পারে না—শক্তির একমাত্র উৎস—হৃদয়।

পেভেল রাইবিনে এমনি ক'রে অনেক কথা কাটা-কাটি চললো।

শেষটা রাইবিন বললেন, আমাদের কইতে হ'বে শুধু বর্তমানের কথা—ভবিষ্যতে কি হ'বে তা' আমাদের অজ্ঞাত। মানুষকে মুক্ত ক'রে দাও, তারপর সে নিজেই বেছে নেবে, তার পক্ষে কোন্‌টা ভালো। তাদের মগজে ঢের বিদ্যা আমরা ঢুঁসে দিয়েছি, এবার এর অবসান হ'ক,—মানুষকে তার নিজের পথ নিজেকে খুঁজে নিতে দাও। হয়তো তারা চাইবে সমস্ত-কিছু বর্জন করতে—সমস্ত জীবন, সমস্ত জ্ঞান; হয়তো তারা দেখবে সকল বন্দোবস্তই তাদের বিরুদ্ধে,—তুমি শুধু তাদের হাতে বইগুলি দিয়ে দাও, তারপর নিশ্চিন্ত থাকতে পারো; সব প্রশ্নের উত্তর তারা নিজেরাই দেখে নিতে পারবে। তাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দাও যে ঘোড়ার লাগাম যত কষানো হয়, তত সে ছোটে কম।

মা ক্রমে ক্রমে এ সব শুনতে অভ্যস্ত হন।

আট

পেভেলের বাড়িটা মজুরদের মস্ত বড় একটা ভরসাস্থল হ'য়ে পড়ল। কোনো অবিচার অত্যাচার হ'লেই মজুররা পেভেলের কাছে বুদ্ধি নিতে আসে। পেভেলকে সবাই শ্রদ্ধা করে, বিশেষত সেই 'কাদা-মাখা পেনি'র গল্পটা বে'র হবার পর।

কারখানার পেছনে একটা জলাভূমি ছিল বুনো গাছে ভর্তি · পচা

জল গরমের দিনে তা' পচে দুর্গন্ধ হয়, মশা জন্মায়; ফলে, চারিদিকে জ্বরের ধুম লেগে যায়। জায়গাটা অবশ্য কারখানার সম্পত্তি; নতুন ম্যানেজার এসে দেখলেন, জলাটা খুঁড়লে বেশ মোটা টাকার পিট্‌ মিলবে, কিন্তু খুঁড়তে বড় কম খরচ হ'বে না। অনেক ভেবে তিনি বিনা খরচায় কাজ হাঁসিল করার একটা চমৎকার মতলব ঠাওরালেন।

পল্লির স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পেই যখন জলাটা সাফ করা আবশ্যক তখন পল্লিবাসী মজুররাই ন্যায়ত তার খরচা বহন করতে বাধ্য; অতএব তাদের মজুরি থেকে রুবেলে এক কোপেক ক'রে এই বাবদ কেটে নেওয়া হ'বে। মজুররা তো একথা শুনেই ক্ষেপে উঠলো, বিশেষ ক'রে যখন দেখলো কর্তার পেয়ারের কেরানীবাবুরা এ ট্যাক্স থেকে রেহাই পেয়েছে।

যেদিন এ হুকুম হয়, পেভেল সেদিন অসুস্থতার দরুণ কারখানায় অনুপস্থিত; কাজেই সে কিছুই জানতে পারলোনা। পরদিন শিজভ এবং মা...টিন ব'লে দু'জন মজুর তার কাছে এসে হাজির হ'ল; বললো, সবাই আমাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলো এই কথাটা জানতে যে, সত্যিই কি এমন কোনো আইন আছে যাতে ম্যানেজার কারখানার মশা তাড়াবার খরচা মজুরদের কাছ থেকে জুলুম ক'রে নিতে পারে! আছে এমন কোনো আইন? তিন বছরের কথা। সেবারও স্নানাগার তৈরি করার নাম ক'রে জোচ্চোররা এমনিভাবে ট্যাক্স বসিয়ে তিন হাজার আটশো রুবেল ঠকিয়ে নিয়েছিল। কোথায় এখন সে রুবেল, কোথায় বা সে স্নানাগার!

পেভেল তাদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলো যে, এ আইন নয়, অত্যাচার! এতে শুধু পকেট ভারি হ'বে কারখানার মালিকের।

মজুর দু'জন মুখ ভারি ক'রে চ'লে গেলো।

তারা চ'লে যেতে মা হাসিমুখে বললেন, বুড়োরাও তোর কাছে বুদ্ধি নিতে আসা শুরু করেছে পেভেল!

পেভেল নিরুত্তরে কাগজ নিয়ে কি লিখতে বসলো। লেখা শেষ হ'লে মাকে বললো এক্ষুনি শহরে গিয়ে এটা দিয়ে এসো।

বিপদ আছে কিছু?—মা প্রশ্ন করলেন।

পেভেল বললো, হাঁ। শহরে আমাদের দলের যে কাগজ ছাপা হয় তার পরবর্তী সংখ্যায় এ 'কাদা-মাখা পেনি' গল্পটা বেরোনো চাই।

যাচ্ছি এক্ষুণি, ব'লে মা গায়ের কাপড়টা ঠিক ক'রে নিলেন। তাঁর যেন আনন্দ আর ধরেনা। ছেলে এই প্রথম তাঁকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর ওপর জরুরী একটা কাজের ভার দিয়েছে। ছেলের কাজে তিনি লাগলেন এতদিনে।

শহরে গিয়ে তিনি কার্যসিদ্ধি ক'রে ফিরে এলেন।

তার পরের সোমবার—মাথা ধরেছে ব'লে পেভেল কারখানায় যায়নি; খেতে বসেছে, এমন সময় কেদিয়া মেজিন ছু'টে এলো রুদ্ধশ্বাসে—তার মুখে উত্তেজনা এবং আনন্দ। বললো, এসো, কারখানা সুদ্ধ মজুর জেগে উঠেছে। তোমাকে ডাকতে পাঠালে তারা। শিজভ মাখোটিন বলে, তোমার মতো ক'রে আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাব্বা, কী কাণ্ড!

পেভেল নিরবে পোশাক পরতে লাগলো।

মেজিন বলতে লাগলো, মেয়েরা জড়ো হয়ে কী রকম চেঁচাচ্ছে দেখো।

মা বললেন, তুই অসুস্থ, ওরা কি করছে কে জানে। চল, আমিও যাচ্ছি।

পেভেল সংক্ষেপে বললো, চলো।

নিরবে দ্রুতপদে তারা কারখানায় এসে উপস্থিত হ'ন। দুয়ারের

কাছে মেয়েরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে আলোচনা চালিয়েছে। তাদের ঠেলে তিনজন কারখানার উঠানের ভেতর এসে ঢুকলো। চারদিকে উত্তেজিত জনতার চিৎকার এবং আস্ফালন। শিজভ মাখোটিন, ভিয়ালভ এবং আরো পাঁচ ছ'জন পাওা একটা পুরানো লৌহস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে হাত দুলিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করছে ;—সবার চোখ তাদের দিকে। হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, পেভেল এসেছে।

পেভেল ? নিয়ে এসো।

তৎক্ষণাৎ পেভেলকে ধ'রে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মা একা পেছনে পড়ে রইলেন।

চারিদিকে কেবল শব্দ হতে লাগলো, চুপ, চুপ ! অদূরে রাইবিনের গলা শোনা গেলো,—আমরা দাঁড়াব, কোপেকের জন্য নয়—ন্যায়ের জন্য। কোপেকের গায়ে যে অজস্র রক্ত মাখানো, তার জন্য।

জনতার কানে বেশ জোরে গিয়ে এ কথাটা পড়লো—সংগে সংগে জেগে উঠলো উত্তেজনাপূর্ণ চিৎকার, সাবাস রাইবিন, ঠিক বলেছ।

আঃ, চুপ করনা।

পেভেল এসেছে।

সবগুলি কণ্ঠ একত্র মিলে সৃষ্টি হ'ল একটা তুমুল কোলাহল,—কলের শব্দ, বাষ্পের ফোঁসফোঁসানি, চামড়ার বেল্টের আওয়াজ, সব তাতে ডুবে গেলো। চারদিক হ'তে লোক ছুটে আসছে, হাত দোলাচ্ছে, তর্কাতর্কি করছে, তিক্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। যে বেদনা এতদিন বের হবার কোনো পথ পায়নি, শ্রান্ত বুকে চাপা রয়েছে, আজ তা' জেগে উঠছে, বের হতে যাচ্ছে, মুখ থেকে ফেটে পড়ছে বাক্য বাণে। আকাশে উঠছে বিরাট এক পাখির মতো বিচিত্র পাখা দুলিয়ে, জনতাকে

নখে জড়িয়ে টেনে-হিঁচড়ে, পরস্পর ঠোকাঠুকি ক'রে;—রোষ-রক্তিম অগ্নিশিখার মতো জীবন নিয়ে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে। জনতার মাথার ওপর ধুলি এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সবার মুখে আগুন জ্বলছে, গাল বেয়ে পড়ছে ঘাম কালো ফোটায়—কালো মুখের মধ্য দিয়ে চোখ জ্বলছে, দাঁত চকচক্ করছে।

শিজভ মাখোটিন যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে উঠে দাঁড়ালো পেভেল, তার কণ্ঠ হ'তে ধ্বনিত হ'ল, স্যাঙাৎ :

কথাটা উচ্চারণ করার সংগে সংগে পেভেলের মধ্যে জাগলো একটা অদম্য আত্মপ্রত্যয়, সংগ্রামেচ্ছা, জনতার কাছে হৃদয় খু'লে ধরার আগ্রহ।

'স্যাঙাৎ'—কথাটা তাকে আনন্দে, শক্তিতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললো। 'আমরা মজুররা গির্জা এবং কারখানা গ'ড়ে তুলি, শৃংখল বানাই, মুদ্রা তৈরি করি, পুতুল গড়ি, কলকজা নির্মাণ করি। আমরাই সেই জীবন্ত শক্তি, যা' আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত ছনিয়াকে বাঁচিয়ে রাখে—আহার এবং আনন্দ জুগিয়ে। সর্বকালে সর্বস্থানে কাজ করার বেলায় আমরাই সবার প্রথমে কিন্তু জীবনের অধিকারে সেই আমরাই সর্ব পশ্চাতে। কে কেয়ার করে আমাদের? কে আমাদের ভালো করতে চায়? কে আমাদের মানুষ বলে স্বীকার করে?—কেউ না।

জনতাও প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো, কেউ না।

শান্ত, সংযত, গভীর, সরল ভাষায় পেভেল বক্তৃতা দিতে লাগলো। জনতা ধীরে ধীরে তার কাছে ঘি'সে এক কালো ঘন সহস্র-শির বপুর মতো হ'য়ে দাঁড়ালো; তাদের শত শত উৎসুক চোখ পেভেলের দিকে নিবদ্ধ। পেভেলের কথাগুলো যেন তারা নির্বাক আগ্রহে গিলছে। পেভেল বলতে লাগলো, শ্রেষ্ঠতর জীবন আমরা কিছুতেই লাভ করতে পারব না

ততদিন—যতদিন না আমরা উপলব্ধি করি, আমরা ভ্রাতাৎ, আমরা বন্ধু ; এক অভিন্ন সংকল্পে পরস্পরে বাধা,—সে সংকল্প কি জানো ? আমাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম।

মার কাছ থেকে কে একজন ব'লে উঠলো, কাজের কথা বলো।

অমনি সংগে সংগে রব হ'ল, গোলমাল করো না, চুপ কর।

একজন মন্তব্য করলো, সোশিয়ালিস্ট, কিন্তু বোকা নয়।

আর একজন বললো, বেশ জোর গলায় বলছে কিন্তু।

তার পর আবার পেভেলের গলা,—'বন্ধুগণ, আজ দিন এসেছে, আমাদের শ্রমভোজী ঐ যে লোভী লক্ষপতির দল, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'বে, আমাদের আত্মরক্ষা করতে হ'বে, বুঝতে হ'বে আমাদের রক্ষা করতে পারব একমাত্র আমরা, অপর কেউ নয়। শত্রুকে যদি ধ্বংস করতে হয় তবে একমাত্র নীতি গ্রহণ করতে হ'বে আমাদের—প্রত্যেকের জন্য সকলে, সকলের জন্য প্রত্যেক।

মাখোটিন চিৎকার করে উঠলো, সাচ্চা কথা বলছে। শোনো ভাই সব, সত্য কথা শোনো।

পেভেল বললো, এক্ষুণি ম্যানেজারকে ডাকবো আমরা, ডেকে জিগ্যেস করব।

পলকে যেন ঘূর্ণিবাত্যায় আহত হ'য়ে জনতা দুলে উঠলো অজস্র কণ্ঠে, চিৎকার হল, ম্যানেজার। ম্যানেজার। সে এসে জবাব দিক।

প্রতিনিধি পাঠাও। তাকে এখানে হাজির কর।

বহু বাদ-বিতর্কের পর প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'ল শিজভ, রাইবিন এবং পেভেল। তারা যাত্রা করবে, হঠাৎ জনতার মধ্যে জেগে উঠলো একটা অনুচ্চ ধ্বনি, ম্যানেজার নিজেই আসছে।

জনতা দু'ফাঁক হ'য়ে পথ ক'রে দিলো, তার মধ্য দিয়ে ম্যানেজার ঢুকলেন। হাত ঈষৎ দুলিয়ে লোক সরিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছেন তিনি ; কিন্তু কাউকে স্পর্শ করছেন না। লম্বা-চওড়া শরীর, কুঞ্চিত চোখ, শাসনকর্তাসুলভ তীক্ষ্ণ-সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার ক'রে তিনি মজুরদের মুখ দেখে নিচ্ছেন ; মজুররা সসম্ভ্রমে টুপি খু'লে হাতে নিচ্ছে, তিনি তাদের অভিবাদন যেন অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। তার উপস্থিতিতে জনতা চুপ ক'রে গেলো, ঘাবড়ে গেলো। সবার মুখে উদ্বেগের হাসি, কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি, শিশু যেন তার ছেলেমির জন্য অনুতপ্ত। ম্যানেজার সেই লৌহস্তূপের ওপর পেভেল, শিজভের সামনে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ জনতার দিকে চেয়ে বললেন, এসব হল্লার মানে কি? কাজ ফেলে এসেছ কেন?

সব চুপ-চাপ। কয়েক সেকেণ্ড গেলো কোনো জবাব নাই। শিজভ মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

ম্যানেজার বললেন, যা' জিগ্যেস করছি, তার জবাব দাও।

পেভেল তার সামনে এগিয়ে গিয়ে শিজভ, রাইবিনকে দেখিয়ে বললো, আমরা এই তিন জন শ্রমিক বন্ধুদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছি, আপনাকে সেই কোপেক-ট্যাক্সটা রদ করতে বলার জন্য।

কেন? পেভেলের দিকে না চেয়ে ম্যানেজার প্রশ্ন করলো।

পেভেল বেশ জোরের সংগেই বললো, এরকম ট্যাক্স আমরা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করিনা।

ওঃ, তা'হলে আমার জলা সাফ করবার প্রস্তাবটায় তুমি দেখতে পাচ্ছ শুধুই মজুরদের শোষণ করার ফন্দি,—তাদের মাংগলেচ্ছা নয়। এই তো?

হাঁ।

আর, তুমি ?—ম্যানেজার রাইবিনকে জিগ্যেস করলেন।

আমারো ঐ একই কথা।

শিজভকে প্রশ্ন করতে সেও ঐ জবাব দিলো।

ম্যানেজার ধীরে ধীরে জনতার দিকে চেয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পেভেলকে বিদ্ধ ক'রে বললেন, তোমাকে দেখে বেশ চোখা লোক মালুম হচ্ছে। তুমি কি প্লানটার উপকারিতা বুঝতে পাচ্ছ না ?

পেভেল জোর গলায় বললো, আমরা বুঝতুম, কারখানার নিজের খরচে যদি জলা সাফ করা হ'ত।

ম্যানেজার রুক্ষ জবাবে বললো, কারখানাটা দাতব্যখানা নয়। আমার হুকুম, এক্ষুণি—এই মুহূর্তে কাজে যাও। এই ব'লে কারও দিকে দৃকপাত না ক'রে ম্যানেজার নিচে নাবতে গেলেন।—জনতার মধ্য থেকে একটা অসন্তুষ্টির চাপা গুঞ্জন শুনে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন, কী !

সব চুপচাপ। দূর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো, তুমি নিজে কাজ করগে।

ম্যানেজার স্পষ্ট ভাষায় বেশ একটু কড়া সুরে বললেন, পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি কাজ শুরু না কর তা'হলে তোমাদের প্রত্যেককে বরখাস্ত করা হ'বে। এই ব'লে তিনি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন। তার যাওয়ার সংগে সংগেই গোলমাল উঠলো।

ওঁকে বলোনা।

ন্যায় বিচার চাইতে গিয়ে এই পেলুম এতো দেখছি ফ্যাসাদ আরও বাড়লো।

পেভেলের দিকে একজন চেঁচিয়ে বললো, কি হে মাতব্বর উকিল,

মা

এখন কি হ'বে? খুব তো বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিচ্ছিলে, কিন্তু যেই ম্যানেজার এলো, অমনি সব ফাঁকা।

তাইতো, কি করা যায় এখন?

গোলমাল এমনি ক'রে বেড়ে উঠতে পেভেল হাত তুলে বললো, বন্ধুগণ, আমি প্রস্তাব করি যে, কোপেক-ট্যাক্স্ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট ক'রে থাকি।

জবাবে শোনা গেলো উত্তেজিত কণ্ঠ-কোলাহল, আমাদের বোকা পেয়েছ আর কি।

আমাদের এই করা উচিত।

ধর্মঘট?

এক কোপেকের জন্য?

না কেন? কেন ধর্মঘট করব না?

আমাদের দল সুদ্ধুর কাজ যাবে।

তা'হলে কাজ করবে কে?

নতুন লোকের অভাব কি।

কারা? জুডাসেরা?

কি বছর মশা তাড়াবার জন্যে আমাদের ত তিন রুবেল যাট কোপেক খরচ করতেই হয়।

সবাইকেই তা' দিতে হ'বে।

পেভেল নেবে গিয়ে মার পাশটিতে দাঁড়ালো। রাইবিন তার কাছে এসে বললো, ওদের দিয়ে ধর্মঘট করাতে পারবে না। একটা পেনির ওপরও ওদের লোভ দুরন্ত, অত্যন্ত ভীতু ওরা; বড় জোর তিনশোকে তুমি দলে টানতে পারো, আর নয়। একগাদা গোবর কি একটা শলা দিয়ে তোলা যায়?

পেভেল চুপ ক'রে রইলো। মজুর সব পেভেলের বাগ্মীতার প্রশংসা করলো কিন্তু ধর্মঘটের সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে কাজে গিয়ে যোগ দিল। পেভেল মনমরা হ'য়ে পড়লো, তার মাথা ঘুরছে আত্মশক্তিতে আর তার বিশ্বাস নেই। ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফিরে এলো।

সেইদিন রাত্রেই পেভেল গ্রেপ্তার হ'ল।

নয়

ছেলেকে হারিয়ে মা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন,—তাঁর প্রাণ কেবলই হা-হা ক'রে বলতে লাগলো, আমায়ও কেন পেভেলের সংগে ধ'রে নিয়ে গেলো না। রাইবিন এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আমার বাড়িতেও তারা হানা দিয়েছিলো, কিন্তু ধরলোনা—ধরলো পেভেলকে। ওদের এই-ই হাল। ম্যানেজার চোখ ইসারা করলো, পুলিশ বল্লো, 'যো হুকুম' আর দেখতে দেখতে একটা লোক অদৃশ্য হ'ল। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। একজনে পকেট মারেন, আর একজনে পরানে মারেন।

মা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের উচিত পেভেলের পক্ষ হ'য়ে লড়া,—তোমাদের সকলের জন্যই সে আজ জেলে গেছে ?

কার উচিত ?

তোমাদের সবার।

রাইবিন কেমন এক শ্লেষের হাসি হেসে বললো, তোমার যে অতিরিক্ত দাবি মা। কেউ ওর কিছুই করবে না। কর্তারা হাজার হাজার বছর ধরে

শক্তি সঞ্চয় করছেন, আমাদের কলজের মধ্যে তারা বহুত পেরেক ঠুকে রেখেছেন আমাদের মধ্যে ব্যবধানের বিরাট দেয়াল। আমরা ইচ্ছে করলেই এক্ষুণি তা' সরিয়ে মিলতে পারিনে এইগুলো বাধা দিচ্ছে এগুলোকে আগে দূর করা চাই।

রাইবিন চ'লে গেলো।

রাত্রে শোময়লোভ এবং য়েগর আইভানোভিচ এসে হাজির হ'ল। আইভানোভিচ বললো, নিকোলাই জেল থেকে বেরিয়েছে, জানো দিদিমা?

তাই নাকি? ক'মাস জেলে ছিল সে?

পাঁচ মাস এগারো দিন। এণ্ড্রি আর পেভেলের সংগে তার দেখা হয়েছে। এণ্ড্রি তোমায় প্রণাম জানিয়েছে আর পেভেল ব'লে পাঠিয়েছে, ভয় নেই। জেল তো যাত্রা-পথের সরাই—যা প্রতিষ্ঠা এবং তদ্বির করছেন কর্তারা অত্যন্ত আগ্রহের সংগে। এখন কাজের কথা হ'ক দিদিমা। কাল ক'জন গ্রেপ্তার হয়েছে জানো?

না। আরো কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে নাকি?

হাঁ, চল্লিশ জন এবং আরো দশজনের হ'বার সম্ভাবনা। তার মধ্যে একজন ইনি—শোময়লোভ।

মা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। পেভেল—পেভেল তা' হ'লে একা নেই। বললেন, এতোগুলি লোক যখন ধরছে তখন বেশিদিন রাখতে পারবেনা।

আইভানোভিচ বললো, সে কথা ঠিক, দিদিমা। আর আমরা যদি ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারি, তাহ'লে ওরা আরো নাকাল হয় কথাটা কি জানো দিদিমা, ওরা গ্রেপ্তার হওয়ার সংগে সংগেই নিষিদ্ধ

ইস্তাহারগুলোও যদি কারখানায় আর না ঢোকে, তবে কর্তারা নির্ঘাত বুঝবেন এসবের পাণ্ডা কারা। পেভেল আর তার সংগীদের তখন জেলে শক্ত ক'রে চেপে ধরবে। কাজেই যেমন ব্রতের খাতিরে, তেমনি পেভেলদের জন্ম আমাদের কারখানার ভেতরে ইস্তাহার বিলির কাজ ঠিক আগের মতোই চালানো চাই। খুব ভালো ভালো ইস্তাহারও হাতে আছে, কিন্তু সমস্যা, তা' কারখানায় ঢোকানো যায় কি ক'রে? কারখানার গেটে আজকাল প্রত্যেকের শরীর তালাশী করা হয়।

মা বুঝলেন, তাঁকে দিয়ে একটা-কিছু করাতে চায় ওরা। ছেলের মংগলের জন্ম কোনো-কিছুই করতে তাঁর আপত্তি নেই; কাজেই বললেন, তা' কি করতে হ'বে আমাকে?

ফেরিওয়ালী মেরি নিলোভ্‌নাকে দিয়ে ইস্তাহারগুলো ঢোকাতে পারো না?

মা ব'লে উঠলেন, ওকে দিয়ে? সর্বনাশ, তা' হ'লে দুনিয়ার কারো জানতে আর বাকি থাকবে না।

তারপর একটু ভেবে বললেন, আমার কাছে রেখে যেয়ো, আমি নিজেই ব্যবস্থা করব। মেরির সাহায্যকারিণী সেজে কারখানায় খাবার নিয়ে যাবো, তখন ধরা পড়বনা সবাই দেখবে পেভেল জেলে গেছে বটে, কিন্তু জেল থেকেও তার হাত কাজ ক'রে যাচ্ছে।

তিনজনের মুখই আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। আইভানোভিচ বলে উঠলো, চমৎকার! শোময়লোভ বললো, এ যদি হয় তো জেল হ'বে আমার কাছে আরামকেদারা! মা ভাবলেন, ইস্তাহার বেরোলে কর্তারা একথা কবুল করতে বাধ্য হবেন, ইস্তাহার বিলির জন্ম পেভেল দোষী নয়। সাফল্যের আশায় এবং আনন্দে মা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন, বললেন, পেভেলকে বোলো, তার জন্ম আমি না করতে পারি হেন কাজ নেই।

আইভানোভিচ মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি পেভেলের জন্য মিছে ভেবোনা, মা। জেল আমাদের কাছে বিশ্রাম এবং পাঠের স্থান—মুক্ত অবস্থায় যার ফুরসুৎ আমাদের মেলেনা। যাক, তা'হলে ইস্তাহারগুলো পাঠাবো। কাল থেকে আবার যুগান্ত-সঞ্চিত-অন্ধকার-নাশী চাকা আগের মতো ঘুরতে আরম্ভ করবে। দীর্ঘজীবী হ'ক আমাদের বাক্যের স্বাধীনতা, আর দীর্ঘজীবী হ'ক এই মাতৃ-হৃদয়!

তারপর তারা বিদায় নিয়ে চলে গেলো। মা একান্ত মনে ভগবানকে ডাকেন আর মংগলাকাজ্ক্ষা করেন। তাঁর মানসপটে পেভেলের সংগে আর সকলকার ছবি ফুটে ওঠে।

মা মেরির কাছে গিয়ে তার সাহায্যকারিণীর কাজ নিলেন।

দশ

পরদিন মজুররা অবাক হ'য়ে দেখলো কারখানায় নতুন এক খাবারওয়ালী —পেভেলের মা।

মেরি নিজে বাজারে গিয়ে মাকে কারখানায় পাঠিয়েছে।

মজুররা দলে দলে মার কাছে এসে দাঁড়ালো। কেউ দেন আশা, কেউ সান্ত্বনা, কেউবা সহানুভূতি, কেউ বা ম্যানেজার এবং পুলিশকে গালি দেয়। কেউ আবার বলে, আমি হ'লে তোমার ছেলের ফাঁসি দিতুম, লোকগুলোকে যাতে সে আর না বিগড়াতে পারে।

মা শিউরে উঠেন।

কারখানার সে কী উত্তেজনা। স্থানে স্থানে মজুরদের ছোট ছোট দল, সবাই ঘোঁট পাকাচ্ছে। চাপা গলায় অত্যন্ত উৎসাহের সংগে। মাঝে মাঝে ফোরম্যানরা মাথা গলিয়ে দেখে যায়, তারা চলে যেতেই ওঠে ক্রুদ্ধ গালাগালি, হাসির হর্‌রা।

মার পাশ দিয়ে শোময়লোভকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে দুটো পুলিশ। পিছু পিছু শ'খানেক মজুরের হল্লা। পুলিশদের উদ্দেশে বিদ্রূপ এবং কটূক্তি বর্ষণ করতে করতে তারা চলেছে। একজন বললো, বাঃ, হাওয়া বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি।

আর একজন বলে উঠলো, নয়তো কি। আমাদের ওরা কম সম্মান করে ?

তৃতীয় জন বললো, হাঁ, বেড়াতে বেরোলেই সংগে সংগে বডিগার্ড চাইতো।

তীব্র তিক্ত স্বরে একচক্ষু জনৈক মজুর বললো, কি করবে। চোর-ডাকাত ধ'রে তো আর মজুরি পোষায়না, তাই নিরীহ লোকদের নিয়ে টানাটানি।

পেছন থেকে আর একজন ব'লে উঠলো, তাও আবার রাত্তিরে নয়। একেবারে খোলা-মেলা দিনে-দুপুরে। লজ্জাও নেই হতভাগাদের।

পুলিশরা এই কটূক্তি এড়াতেই যেন দ্রুত পা চালিয়ে দিল ; মজুরদের কথা যে কানে যাচ্ছে এমনই মনে হ'লনা।

শোময়লোভ হাসি-মুখে জেলে গেলো। মার মনে হ'ল যেন তার আর একটি ছেলেকে কে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। এই যে হাসি মুখে জেলে যাওয়া, এর মাঝেও পেভেলেরই প্রভাব।

সমস্ত দিন পরে মা বাড়ি ফিরে এলেন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে

এলো। মা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সে রইলেন, আইভানোভিচ কখন আসে ইস্তাহার নিয়ে।

হঠাৎ একসময়ে দ্বারে মৃদু করাঘাত হ'ল। মা দ্রুত গতিতে দোর খুলে দিয়ে দেখেন শশেংকা,—দেখেই মার মনে হল, শশেংকা যেন অস্বাভাবিক রকমের মোটা হ'য়ে পড়েছে। বললেন, এতোদিন এদিক মাড়াওনি যে, ব্যাপার কি?

শশেংকা হেসে বললো, জেলে ছিলুম যে মা। পোশাকটা বদলাতে হ'বে আইভানোভিচ আসার আগে।

তাইতো, একেবারে নেয়ে উঠেছ যে!

ইস্তাহারগুলো এনেছি।

দাও, আমার কাছে দাও, মা অধীর আগ্রহে ব'লে উঠলেন।

দিচ্ছি—ব'লে শশেংকা গায়ের চাদরটা খুলে ঝাড়া দিল, আর মায়ের সামনে পাতা-ঝরার মতো পড়তে লাগলো ভুঁয়ে একরাশি পাতলা কাগজের পার্শেল। মা হেসে তা' কুড়িয়ে নিলেন, বললেন, তাইতো অবাক হচ্ছিলুম, এতো মোটা হ'লে কি ক'রে। বড় কম তো আনোনি? এসেছ কি ক'রে—হেঁটে?

হাঁ।

মা চেয়ে দেখলেন, সেই অস্বাভাবিক মোটা মেয়েটি আবার আগের মতো অসামান্য সুন্দরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চোখের নিচে কালি। বললেন, এতদিন জেলে ছিলে মা, এবার একটু বিশ্রাম নেবে, না, সাত মাইল এই মোট ব'য়ে নিয়ে এসেছ

এ তো করতেই হ'বে মা। সে যা'ক—পেভেলের কথা বলো। সে ঠিক আছে তো? ভয় খায়নি তো?

না, মা। সে পিছাবে না, এটা ধ্রুব সত্য ব'লে ধরে নিতে পারো।

শশেংকা ধীরে ধীরে বললো, কী শক্তিমান পুরুষ এই পেভেল !

মা বললেন সে কথা ঠিক। অসুস্থ সে কখনো হয়নি। কিন্তু তুমি যে শীতে কাঁপছ, দাঁড়াও, চা আর জ্যাম্ এনে দিচ্ছি।

মৃদুহাস্যে শশেংকা বললো, তোফা, কিন্তু মা এত রাতে তোমার কিছু করবার দরকার নেই, আমি নিজ হাতে করছি।

হ্যাঁ, তা বৈকি। এই রোগা ক্লান্ত শরীর নিয়ে—নয়? তিরস্কারের সুরে এই কথা ব'লে মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। শশেংকাও গেলো তাঁর পিছু-পিছু। মা চা করছেন, আর সে একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়ে বললো, হাঁ মা, সত্যিই আমি বড়ো ক্লান্ত। জেলখানা মানুষকে নির্জীব ক'রে দেয়। এই বাধ্যতামূলক কর্মহীনতাই হচ্ছে সেখানকার সব চেয়ে ভয়ের কথা। এর চেয়ে পীড়াদায়ক আর কিছু নেই। এক হপ্তা থাকি, পাঁচ হপ্তা থাকি—বাইরে কতো কাজ করবার আছে তাতো জানি। জানি যে, মানুষ আজও জ্ঞানের জন্য বুভুক্ষিত—আমরা তাদের অভাব পূর্ণ করতে সক্ষম কিন্তু কি করব, পশুর মতো বন্দী আমরা। এইটেই অসহ্য বোধ হয়—প্রাণ যেন শুকিয়ে যায়।

মা বললেন, কিন্তু এর জন্য কে তোমাদের পুরস্কৃত করবে? তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাসের সংগে তিনিই তার জবাব দিলেন, ভগবান। কিন্তু তাকে তো তোমরা বিশ্বাস করোনা।

না—শশেংকা সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বললো।

নিজের ধর্মবিশ্বাসের মর্ম বুঝলে না তোমরা, ভগবানকে হারিয়ে জীবনের এপথে কেমন ক'রে চলবে তোমরা?

বাইরে জোর পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মা চমকে উঠলেন।

শশেংকা উঠে দাঁড়ালো। ফিস্‌ফাস্‌ করে বললো, দোর খুলো না। পুলিশ যদি হয়, বলবে আমাকে চেনোনা—'আমি ভুলে এ বাড়িতে এসে পড়েছি। হঠাৎ মূর্চ্ছা গেছি তুমি পোশাক ছাড়াতে গিয়ে দেখেছ ইস্তাহার ' বুঝলে ?

কেন ? কিসের জন্য ?

চুপ। এতো পুলিশ নয়, মনে হচ্ছে, আইভানোভিচ।

সত্যিই আইভানোভিচ এসে ঘরে ঢুকলো। শশেংকাকে দেখে বললো, এরি মধ্যে এসে গেছ তুমি।

মার দিকে ফিরে বললো, তোমার এ মেয়েটি দিদিমা পুলিশের গায়ের কাঁটা। জেল-পরিদর্শক কি একটা অপমান করায় পণ করে বসলো, ক্ষমা না চাইলে অনশন ক'রে মরবে। আটদিন পর্যন্ত কিছু খেলো না,—মরে আর কি ?

মা অবাক হয়ে বললেন, বলো কি। পারলে পরপর আটদিন না খেয়ে থাকতে ?

শশেংকা তাচ্ছিল্য ভরে ঘাড় দুলিয়ে বললো, কি করব। তাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াতে হবে তো।

যদি মারা যেতে ?

যেতুম—গত্যন্তর ছিলনা। কিন্তু শেষটা সে বাধ্য হয়েছিল ক্ষমা চাইতে অপমান কখনো ক্ষমা করতে নেই মা।

মা ধীরে ধীরে বললেন, হাঁ, অথচ আমরা স্ত্রীলোকরা জীবনভোর অপমান সয়ে আসছি।

চা পান ক'রে শশেংকা শহরে যাবে বলে উঠে পড়লো। এত রাত্তিরে একা কি ক'রে যাবে ভেবে শংকিত হ'য়ে মা তাকে থাকতে বললেন ; কিন্তু সে

শুনলোনা। শহরে তাকে ফিরতেই হ'বে। আইভানোভিচের কাজ আছে বলে সেও তার সংগে যেতে পারলো না। মা শশেংকার জন্য দুঃখ করতে লাগলেন। আইভানোভিচ বললো, জমিদারের আদুরে মেয়ে ওর সইবে কেন? জেলে গিয়ে ওর দেহ ভেঙে পড়েছে। জানো দিদিমা, ওরা দু'টিতে বিয়ে করতে চায়!

কারা?

ও আর পেভেল। কিন্তু এতোদিন ও পেরে ওঠেনি। ইনি যখন জেলে, উনি তখন বাইরে। উনি যখন জেলে, ইনি তখন বাইরে।

মা বললেন, জানিনে তো। কেমন করে জানবো? পেভেল আমার কাছে তো কিছু বলেনা।

শশেংকার জন্য মার বুকটা যেন আরো দরদে ভ'রে উঠলো।

আইভানোভিচ বললেন, তুমি শশেংকার জন্য দুঃখ করছ দিদিমা, কিন্তু ক'রে কি হবে? আমাদের বিদ্রোহীদের সবার জন্য যদি তোমার চোখের জল ফেলতে হয়, তো চোখের জলও তো অতো পাবে না—অশ্রু-উৎস শুকিয়ে যাবে তোমার। জীবন আমাদের কাছে মোটেই সহজ নয়। আমার এক বন্ধুর কথাই বলি—এই দিনকয়েক আগে তিনি নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি যখন নোভোগোরদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তার স্ত্রী স্মোলেনস্কে তার প্রতীক্ষা করছেন; তিনি যখন স্মোলেনস্কে পৌছালেন, তখন তার স্ত্রী মস্কোর কারাগারে। এবার স্ত্রীর সাইবেরিয়া যাওয়ার পালা। বিদ্রোহ এবং বিবাহ—এদুটো পরস্পরবিরোধী এবং অসুবিধাজনক জিনিস—স্বামীর পক্ষেও অসুবিধা, স্ত্রীর পক্ষেও অসুবিধা, কাজের পক্ষেও অসুবিধা। আমারও একজন স্ত্রী ছিল, দিদিমা, কিন্তু এমনি ধারা জীবন পাঁচ বছরের মধ্যে তাকে কবরশায়ী করেছে।

একচুমুকে চায়ের কাপ নিঃশেষ ক'রে সে তার দীর্ঘ কারা-জীবন এবং নির্বাসন কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেলো।

মা নিঃশব্দে সব শুনলেন। তারপর গুপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

এগারো

পরদিন দুপুরে আবার খাবার নিয়ে মা কারখানার দুয়ারে এসে হাজির হলেন। আজ ভারি কড়া পাহারা। জামার পকেট থেকে শুরু ক'রে মাথার চুল পর্যন্ত খুঁজে তবে এক-একজন লোককে ঢুকতে দেওয়া হয়। মা এগিয়ে গিয়ে বললেন, এক বারটি ঢুকতে দাওনা বাবা। 'বড্ড ভারি, আর' বইতে পাচ্ছিনে, পিঠ দু'ভাগ হ'য়ে যাচ্ছে।

যা যা বুড়ি, ভেতরে যা দেখোনা, উনিও আসেন যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে।

মা ঢুকে পড়লেন। তারপর যথাস্থানে খাবারের পাত্র দুটো নাবিয়ে রেখে ঘাম মুছে ফেলে চারদিকে চাইলেন। গুসেভ ভ্রাতৃদ্বয় কারখানায় কামারের কাজ করে—তারা তৎক্ষণাৎ কাছে এসে দাঁড়ালো। বড়ো ভাই ভ্যাসিলি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলো, পিরগ পেলে?

হাঁ, কাল আনবো।

এই ছিল নির্ধারিত গুপ্ত-সংকেত। দু'ভায়ের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। আইভান হৃদয়াবেগ কিছুতেই সামাল করতে পারলো না, ব'লে উঠলো, ওঃ, এমন মা আর হয় না!

ভ্যাসিলি মাটিতে আসন ক'রে ব'সে খাবারের পাত্রটার দিকে ঝুঁকে পড়লো, আর অমনি এক বাণ্ডিল ইস্তাহার এসে তার বুকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরক্ষণেই তা' তার জুতোর মধ্যে পায়ের তলায় চ'লে গেলো।

এমন চটপট কাজটা হ'য়ে গেলো যে অন্য কেউ তা' একদম লক্ষ্য করতে পারলো না। ভ্যাসিলিও তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য বাজে কথা বললে, বাড়িতে না গিয়ে আজ এসো এইখানে এই বুড়িমার কাছ থেকে খাবার খাই।

মা ক্রমাগত হাঁকেন, চাই টক্ কপির স্যুপ, গরম ঝোল, রোস্ট মাংস। আর এক-এক ক'রে ইস্তাহারের বাণ্ডিলগুলো আইভান ভ্যাসিলির কাছে চালান দেন। মজুরদল কাছে এসে পড়াতে মা ইস্তাহার দেওয়া থামিয়ে দিয়ে খাবারের হাঁক হাঁকতে লাগলেন। মজুররা এলো, খাবার খেলো, চলে গেলো। তারপর মা আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন এবং শেষ করলেন।

সাফল্যের আবেগে আনন্দে তাঁর সমস্ত দিনটা এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যে কাটলো।

রাত্রে এণ্ড্রি এসে হাজির হ'ল। সে কারামুক্ত হ'য়ে এসেছে অথচ পেভেল কোথায়?—মা এণ্ড্রির বুকে মুখ লুকিয়ে ছোটো মেয়েটির মতো কাঁদতে লাগলেন। এণ্ড্রি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কেঁদোনা মা, পেভেলের জন্য কোন ভাবনা নেই, সে তোফা আছে। শীগ্গিরই জেল থেকে ফিরে আসবে।

এণ্ড্রি মার কাছে সবিস্তারে জেলের দৈনিক জীবনযাত্রাকাহিনী বর্ণনা করে গেলো। মা একটু আশ্বস্ত হলেন, তারপর বললেন, আজ কি করেছি জানো?

কি?

মা ইস্তাহার-বিলির কাহিনী বললেন। এণ্ড্রি উল্লসিত হ'য়ে বললো,

চমৎকার মা। এতে যে আমাদের কাজ কতটা এগিয়ে গেলো, কতো সুবিধা হ'ল তা' বোধ করি তুমি নিজেও বোঝনি।

মায়ের প্রাণ এক-টুকুতেই খুলে যায় স্নেহাকাঙ্ক্ষী সন্তানের কাছে। এণ্ড্রির কাছেও মা তার করুণ জীবনকাহিনী বিবৃত করে বললেন, স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের মুখ চেয়ে রইলুম। সেই ছেলে যখন বাপের মতো বিপথে পা দিলো, তখন কত যে ব্যথা পেলুম প্রাণে, তা' তোমায় কেমন ক'রে বোঝাব, এণ্ড্রি? জানি, আমার এ ভালোবাসা স্বার্থ-দুষ্ট সংকীর্ণ—তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেমন পরের দুঃখ বরণ করে নাও, আমি তো তা পারিনে। আমি আমার নিকট-আত্মীয়দের ভালোবাসি, পেভেলকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি—বোধ হয় পেভেলের চাইতেও বেশি পেভেল বড চাপা। আমাকে কিছু বলে না। শশেংকাকে বিয়ে করতে চায়—আমি মা, আমাকেও একথাটা জানালোনা।

এণ্ড্রি বললো, এ সত্যি নয় মা,—আমি জানি এ সত্যি নয়। পেভেল শশেংকাকে ভালোবাসে একথা ঠিক, কিন্তু বিয়ে করতে চায়না; বিয়ে করতে পারেনা, বিয়ে করবেনা।

বিষণ্ণ চোখে মা বললেন, হাঁরে, এমনি ক'রে কি তোরা নিজেদের বলি দিবি?

এণ্ড্রি নিজের মনেই ব'লে চললো, পেভেল অসাধারণ মানুষ—লোহার মতো শক্ত তার মন।

মা চিন্তাকুল কণ্ঠে বললেন, কিন্তু সে আজ বন্দী। মন প্রবোধ মানে না। যদিও জানি সোনার ছেলে তোমরা, মানুষের হিতের জন্য এই কঠোর জীবন বরণ ক'রে নিয়েছো, সত্যের জন্য এই জীবন-ভরা দুঃখকে স্বীকার করেছো

কি সে সত্য তাও আমি জানি, ধনী যতদিন থাকবে দুনিয়ায়, মানুষ কিছু পাবে না—সত্যও না, সুখও না। এ সাচ্চা কথা, এণ্ড্রি।

এণ্ড্রি ধীরে ধীরে বললো, ঠিক কথা মা। কার্চে একজন ইহুদী কবি ছিলেন। একবার তিনি লিখলেন,—

সত্য তাদের করিবে জীবন দান,
বিনা দোষে যারা ফাঁসি কাঠে দিল প্রাণ।

ঘটনাচক্রে কার্চের পুলিশের হাতেই তিনি খুন হলেন। হ'ন, কথা তা নয়। কথা হচ্ছে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা' প্রচার করার জন্য অনেক-কিছু করেছিলেন, তিনি সত্য ব্যক্ত করেছিলেন।

এমনি ক'রে সে রাতটা কাটলো।

বারো

পরদিন কারখানার গেটে যেতেই রক্ষীরা বেশ রূক্ষভাবে মাল মাটিতে নাবিয়ে মাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা করলো।

মা বললেন, আমার খাবার জুড়িয়ে যাবে, বাবা।

চোপ্ রও—একজন রক্ষী বললো।

আর একজন বললো, ইস্তাহারগুলো নিশ্চয়ই বেড়ার ওপর দিয়ে ছুড়ে দেওয়া হয়।

মা রেহাই পেলেন।

বুড়ো শিজভ এসে বললো চাপা গলায়, শুনেছ তো মা?

কি?

ইস্তাহারগুলো আবার দেখা দিয়েছে। রুটির ওপর চিনির মতো ক'রে

ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ওরা। অথচ শাস্তি হ'ল এর জন্য আমার ভাইপোর তোমার ছেলের। এখন পরিষ্কার দেখা গেলো, ওরা নিরপরাধ।

তারপর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, বাবা, এ মানুষ নয় যে হুমকি দিয়ে দমিয়ে রাখবে। এ ভাবধারা—একে পোকার মতো টিপে মার চলে না।

মা খাবার হাঁকতে লাগলেন। আর দেখলেন কারখানায় সেদিন সে কী উত্তেজনা। মজুররা আলাপ-আলোচনা আনন্দে উচ্ছল। একজন বলছে বাছাধনরা সত্য কথা সইতে পারে না।

কর্তারা ক্রুদ্ধ বিব্রত হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন। একজন বলছেন, ব্যাটার হাসছে দেখো। হাসবার মতো বিষয় কিনা,—ম্যানেজার যা' বলেন ঠিক—আমূল ধ্বংস করতে চায় ওরা। ব্যাটাদের শুধু আগাছার মতো ওপড়াতে হ'বে না, একেবারে চষে একশা ক'রে দিতে হ'বে।

আর এক কর্তা বীর দর্পে অদৃশ্য দুশমনের উদ্দেশে আস্ফালন ক'রে বললো যা খুশি ছাপা, ব্যাটা বজ্জাত, কিন্তু খবর্দার আমার বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছিস কি মরেছিস।

গুসেভ এসে মাকে বললো, আজ আবার তোমার কাছে খেতে এসেছি মা। ওঃ, যা খাবার তুমি দিয়েছ মা, চমৎকার, অতি চমৎকার।

মা খুশি হলেন, ভাবলেন, আমাকে না হ'লে এদের চলবে কি ক'রে অদূরে একজন মজুর বলছে, আমি পেলুম না একখানা কোথাও।

আর একজন বলছে, শুনতে বেশ লাগে কিন্তু। পড়তে না পারলেও এটা বুঝি, বাছাধনদের আঁতে বেশ একটু ঘা লেগেছে।

তৃতীয় জন বললো, বয়লার ঘরে চলো, পড়ে শোনাচ্ছি।

গুসেভ ইঙ্গিত ক'রে বললো, দেখছ মা, কেমন কাজ করছে?

মা খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। এণ্ড্রুকে বললেন, ওরা দুঃখ করছিল পড়তে জানেনা ব'লে। আমিও তো তাই—সেই ছোটবেলা যতটুকু যা শিখেছিলুম, স্রেফ ভুলে ব'সে আছি।

আবার শেখো মা।

মরতে বসেছি, এখন শেখবো? ঠাট্টা করিসনি বাছা!

এণ্ড্রু কিন্তু শেলফ্ থেকে একটা বই নিয়ে মাকে বর্ণপরিচয় করাতে লেগে গেলো। ছুরির ডগা দিয়ে একটা অক্ষর দেখিয়ে বললো, এটি কি?

আর।

এটা?

এ।

এমনিভাবে মা'র শিক্ষা শুরু হ'ল।

পড়তে পড়তে এক সময় মা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, এক পা যখন কবরে, তখন বসলুম বই নিয়ে।

এণ্ড্রু সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কেঁদোনা মা। তোমার দোষ কি? জীবন তো আর তুমি ইচ্ছে ক'রে অমন ভাবে কাটাওনি। তুমি তবু বুঝতে পাচ্ছ, কী শোচনীয় জীবন তোমাদের। অনেকে কিন্তু এই কথাটাই বুঝতে পারেনা। হাজার হাজার লোক গরু-বাছুরের মতো বেঁচে থেকে বড়াই করে, তোফা আছি। কিন্তু কোথায় তোফা তাদের জীবন! আজ কাজ শেষ হ'লে খাওয়া, কালও কাজ শেষ হ'লে খাওয়া, পরশু তাই—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঐ একই রুটিন কাজ আর খাওয়া। সংগে সংগে কাচ্চা-বাচ্চার দল আমদানি, দু'দিন তাদের নিয়ে আমোদ; তারপরে রুটিতে টান পড়লে তাদেরই ওপর রাগের ঝাল ঝাড়া, 'খালি গোগ্রাসে গেলা, বড়োও হয় না যে, কাজ ক'রে একটু সাহায্য করবে।' ছেলেমেয়েদের তারা ভারবাহী পশু করে

তোলে। পেটের জন্য খাটে, জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলে একটা চুরি-করা পচা ঝাড়নের মতো। প্রাণ তাদের চঞ্চল হয়ে ওঠেনা আনন্দের সাড়ায়, কখনো দ্রুত তালে বেজে ওঠেনা হৃদয়দ্রাবা ভাবের আবেগে। কেউ বাঁচে ফকিরের মতো ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রে, কেউ জীবন কাটায় চোরের মতো পরের জিনিস নিয়ে। কর্তারা চোরের আইন তৈরি করেছে, লাঠি-ধারী রক্ষীদল মোতায়েন করে তাদের বলছে, আমাদের তৈরি আইন রক্ষা কর। ভারি সুবিধার আইন এগুলো—জনসাধারণের রক্ত শুষে নেওয়ার অধিকার আমাদের দিয়েছে।' বাইরে থেকে মানুষদের চেপে পিষে নিঙড়ে নিতে চায় ওরা, কিন্তু মানুষ বাধা দেয়। তাই ভিতরে এই আইন চালানো—যুক্তি-শক্তিও যাতে তাদের লোপ পেয়ে যায়। মানুষ একমাত্র তারাই, যারা শৃংখল নষ্ট করে, মানুষের মনের শৃংখল অপসারিত করে। তুমিওতো তাই করতে চলেছ মা—তোমার সাধ্যমত ?

আমি। আমি কী করতে পারি এণ্ড্রি।

কি করতে পারবে না মা? কেন পারবে না? বর্ষা-ধারার মতো আমাদের কাজ—এর প্রত্যেকটি ফোঁটা বীজকে পরিপুষ্ট করে। যখন তুমি পড়তে শিখবে মা, তখন হাঁ, তোমায় শিখতেই হবে ভ্লাসভা দেখি, প্যেভেল ফিরে এসে কতটা অবাক হবে!

মা মনোযোগী ছাত্রীর মতো বই নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

তেরো

দরজায় শব্দ হতে মা খুলে দিয়ে দেখেন রাইবিন।

রাইবিন বললো, তুমি একা মা ?

হাঁ।

তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমার একটা থিওরী আছে।

মা উদ্বেগে, আশংকায় রাইবিন কি যেন বলে ভেবে তার দিকে চাইলেন।

রাইবিন বললো, সব-কিছুর মূলে চাই টাকা। এই ইস্তাহারগুলোর টাকা জোগায় কে ?

মা বললেন, জানিনে তো।

রাইবিন বললো, তারপর, দ্বিতীয় জিগাস্য, এসব লেখে কারা ? শিক্ষিত লোকেরা, কর্তারা। কর্তারা এই সব বই লিখে ছড়ায়—এবং এই বইতে তাঁদেরই বিরুদ্ধে কথা থাকে ? এখন আমায় বল মা, কেন কর্তারা তাদের অর্থ এবং সময় ব্যয় করে, তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই লোক ক্ষেপিয়ে তোলে ?

মা ভীত হ'য়ে বললেন, তোমার কি মত ?

রাইবিন বললো, আমার মত ! যখন ঠিক পেলুম জিনিষটা, আমার সর্বাংগ শিউরে উঠলো।

কি—কি ঠিক পেলে ?

প্রবঞ্চনা, প্রতারণা—হাঁ, ঠিক তাই। জানিনে ভালো ক'রে, তবু অনুভব করি—কর্তারা কোন একটা লীলা করছেন। আমি ওসব চাই নে। আমি চাই সত্য এবং সত্য কি তা আমি বেশ জানি, কর্তাদের হাতধরাধরি করে

চলবনা আমি। আমি জানি ওদের সুবিধার জন্য যখন দরকার হবে, তখন ওরা আমাকে সামনে ঠেলে দেবে, তারপর আমার হাড় মাড়িয়ে ওরা ওদের ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছাবে।

মা ব্যথিত সুরে বললেন, হা ভগবান, পেভেলরা কি তবে এ সব কথা বোঝেনা? না না, আমি এ বিশ্বাস করতে পারিনা। তাদের লক্ষ্য—সত্য, সম্মান, বিবেক কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই তাদের।

কাদের কথা বলছ, মা?

সকলের কথা, প্রত্যেকের কথা। মানুষের রক্ত নিয়ে কারবার যারা করে, তারা সে মানুষ নয়।

রাইবিন মাথা নিচু করে বললো, তারা না হতে পারে মা, কিন্তু তাদের পেছনে তো এমন একদল লোক থাকতে পারে, যাদে উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি—এমনি এমনি কেউ আর নিজেদের বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপায় না তুমি আমার কথা ঠিক জেনে রেখো, মা কর্তাদের কাছ থেকে কখনো কিছু ভালো পাওয়া যাবে না।

মা ভয় পেয়ে বললেন, তা' তোমার মতটা কি বলতো?

আমার মত। কর্তাদের কাছ হ'তে তফাৎ থাকো, [illegible]স্—এইমাত্র।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ-চাপ থেকে ধীরে ধীরে বললো, [illegible] যাচ্ছি মা, লোকদের সংগে গিয়ে মিশব, তাদের সংগে কাজ করব। একাজের যোগ্য আমি। লিখ্‌তে পড়তে জানি, খাটতে পারি, বোকাও নই; আর সব চেয়ে বড়ো কথা, লোকদের কি বলতে হ'বে তা আমি জানি। জানি, কর্তাদের বিশ্বাস করা চলে না। জানি, মানুষের আত্মা আজ কলুষিত, বিদ্বেষ-বিষ-দুষ্ট, সবাই পেট বোঝাই করবার জন্য ব্যগ্র—কিন্তু খাবার কই? তাই তারা পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি করে।· আমি যাবো গ্রামে·· পল্লিতে—আর

লোকদের জাগাবো ; তাদের আজ নিজের হাতে একাজ নেওয়া দরকার, নিজের হাতে একাজ করা দরকার। তারা একবার বুঝুক, তারপর নিজেরাই নিজেদের পথ খুঁজে নেবে। আমি যাচ্ছি শুধু তাদের বোঝাতে, তাদের একমাত্র আশা তারা নিজেরা, তাদের একমাত্র বুদ্ধি তাদের নিজেদের বুদ্ধি, এই হচ্ছে সত্য।

মা ধীরে ধীরে বললেন, তোমায় ধরবে ওরা।

ধরবে, আবার ছেড়ে দেবে। আবার আমি এগিয়ে চলবো।

চাষারাই তোমায় বাঁধবে, তোমায় জেলে দেবে।

দিক, কিছুকাল জেলে থেকে আবার বেরুব, আবার চলবো। চাষারা একবার বাঁধবে, দু'বার বাঁধবে, তারপর তারা বুঝবে, আমাকে বাঁধা উচিত নয়, আমার বক্তব্য শোনা উচিত। আমি তাদের ডেকে বলবো, বিশ্বাস করতে বলছিনা তোমাদের, শুধু কথাগুলো শোনো। আমি জানি, তারা যখন শুনবে তখন বিশ্বাস করবে।

মা বললেন, তুমি মারা পড়বে, রাইবিন।

রাইবিনের কালো গভীর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। মার দিকে চেয়ে বললো, খৃস্ট নিজের সম্বন্ধে কি বলেছিলেন জানো : তুমি মরবেনা, নতুন অংকুরে [illegible] উঠবে। আমি বিশ্বাস করিনা, আমি এতো সহজে মরবো। আমি বুদ্ধি রাখি, সোজা পথে চলি ; কাজেই গতি আমার অপ্রতিহত। শুধু জানিনা, কেন আমার প্রাণে ব্যথা জাগে। হাঁ আমি যাবো তাড়িখানায় যাবো, লোকদের কাছে যাবো কিন্তু এগুি কই ? এখনো আসছেনা যে। এরি মধ্যে আবার কাজে লেগেছে বুঝি !

হাঁ। জেল থেকে বেরুতে না বেরুতেই ওদের কাজ।

এইতো চাই। তাকে আমার কথা বোলো।

বলবো।

এবার উঠি।

কারখানার কাজ ছাড়বে কবে ?

ছেড়ে দিয়েছি তো !

যাচ্ছ কখন ?

কাল ভোরে।

রাইবিন চলে গেলো। মা একা বসে রইলেন। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। তার দিকে চেয়ে মা শিউরে উঠলেন, এই অন্ধকারের জীব আমি চির

এণ্ড্রি এলে মা রাইবিনের কথা বললেন। শুনে এণ্ড্রি নেচে উঠলো, যাচ্ছে ?—চমৎকার। সত্যের ডংকা বাজিয়ে যাক সে গ্রামে গ্রামে, লোকদের জাগিয়ে তুলুক,—আমাদের সংগে এখানে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর।

মা বললেন, কর্তাদের কথা বলছিল সে। সত্যিই কি তাই ? কর্তারা কি তোমাদের প্রবঞ্চিত করছেন না ?

এণ্ড্রি বললো, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ বুঝি মা ? তা যা বলেছে, টাকা নিয়েই যতো গোলমাল। ওঃ, টাকা যদি থাকতো [illegible] রা এখন আছি ভিখের ওপর এইতো ধরো নিকোলাই, পঁচাত্তর রুবেল মাইনে পায়, তার পঞ্চাশ রুবেলই আমাদের দেয়। অন্যাই সবাইও তাই। ছাত্ররা খেতে পায় না, তবুও একটি একটি ক'রে কোপেক জমিয়ে আমাদের পাঠায়। কর্তাদের কথা বলছিলে ? হাঁ, তাদের মধ্যেও রকমফের আছে বৈকি ! কেউ আমাদের ঠকাবে, ছেড়ে যাবে আবার কেউ আমাদের সংগে থাকবে, সে উৎসব-দিবসে আমাদের সহযাত্রী হ'বে। উৎসব-দিবস জানি তা দূরে,

বহু দূরে। কিন্তু পয়লা যে আমরা একবার তার অনুষ্ঠান ক'রে আনন্দ করব।

তার কথায়, তার আনন্দে মার মন হতেও দুশ্চিন্তা দূর হল। এণ্ড্রি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো, তারপর আবার বললো, জানো মা, প্রাণের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক আশ্চর্য ভাব জাগে! যেখানে যাও, মনে হবে, সকল মানুষ তোমার স্বজাত—সবার মাঝে একই আগুন দীপ্ত, সবাই আনন্দময়, সবাই ভালো। কথা নেই, অথচ সবাই সবাইকে বোঝে। কেউ কাউকে বাধা দিতে চায় না, অপমান করতে চায় না। তার আবশ্যকও বোধ করেনা। সবাই একতাবদ্ধ, প্রত্যেকটি প্রাণ গায় তার নিজের গান। সমস্ত গানের তরংগ সম্মিলিত হ'য়ে প্রবাহিত হয় এক বিশাল, বিরাট, মুক্ত-স্রোতা আনন্দের নদী। যখন তুমি এই কথা ভাববে মা, যখন ভাববে, এ হ'বে, এ না হ'য়ে পারে না, তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রাণ আনন্দে গ'ল যাবে। এতো আনন্দ যে, তা তুমি সামলাতে পারবে না, চোখ সজল হ'য়ে উঠবে। কিন্তু এ স্বপ্ন হ'তে যখন জেগে উঠবে, যখন সংসারের দিকে চাইবে, দেখবে সব-কিছু তোমার চারপাশে ঠাণ্ডা, নোংরা,—সবাই শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, কর্মব্যস্ত সংসারের চল্‌তি প'থে মানব জীবন কাদার মতো মথিত হচ্ছে, পদদলিত হচ্ছে। হাঁ, ব্যথা পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তোমায় মানুষকে অবিশ্বাস করতে হ'বে, ভয় করতে হ'বে, ঘৃণা করতে হ'বে। মানুষ বিভক্ত, জীবন মানুষকে দু'টুকরো ক'রে রেখেছে। তুমি তাকে ভালোবাসতে চাইবে, কিন্তু কি ক'রে বাসবে? কি ক'রে ক্ষমা করবে সে মানুষকে, যে তোমায় আক্রমণ করছে বন্য পশুর মতো। বুঝছেনা যে তোমার মধ্যে একটা আত্মা আছে, তোমার মুখে—মানুষের মুখে আঘাত দিচ্ছে। তুমি ক্ষমা করতে পারোনা—তোমার নিজের কথা ভেবে নয়, মানবজাতির কথা ভেবে। নিছক ব্যক্তিগত

অপমান আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু অত্যাচারীকে অপমান করার আস্কারা দিতে পারি না। মানুষকে মারার, হাত পাকাবার জন্ম আমার পিঠ পেতে দিতে পারিনা।

মা চুপ করে শুনতে লাগলেন। এণ্ড্রির চোখ জ্বলছে। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, নোংরা যা তা আমাকে আঘাত না দিলেও তাকে আমি ক্ষমা করবোনা। আমি একা নই দুনিয়ায়। আজ যদি আমি আমাকে অপমানিত হতে দিই—হয়তো আমি তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি, গায়ে না মাখতে পারি, কিন্তু অপমানকারী যে, সে আজ আমার ওপর শক্তি পরীক্ষা ক'রে বর্ধিত স্পর্ধায় কাল আর একজনের পিঠের চামড়া তুলবে। এই জন্মই আমরা বাধ্য হই, মানুষে মানুষে তফাৎ করতে—যারা অত্যাচারী তাদের দূরে রাখতে, যারা সত্যের জন্ম লড়াই করছে তাদের আপনার বলে টেনে নিতে। বিপদই হচ্ছে এইখানে। দু'রকম চোখ নিয়ে তোমায় দেখতে হ'বে,—একটা বলে, সবাইকে ভালোবাসো, আর একটা বলে, হুঁশিয়ার, ও তোমার দুশমন। কেন? কারণ, এটা অদ্ভুত হলেও সত্য যে, মানুষ আজও এক-সমতলে দাঁড়িয়ে নেই।

মানুষের মধ্যে সাম্য আনতে হ'বে আমাদের, সকল মানুষকে এক সারিতে দাঁড় করাতে হবে আমাদের, মাথা দিয়ে বা হাত দিয়ে মানুষ যত-কিছু সুখ-সুবিধার সৃষ্টি করেছে, সব আজ নিখিল মানুষের মধ্যে সমান ভাবে বেঁটে দিতে হবে। মানুষকে আর পরস্পর ভয়ের এবং হিংসার গোলাম, লোভের এবং বোকামির দাস ক'রে রাখবোনা।

এমনি কথাবার্তা প্রায়ই চলতো মা এবং এণ্ড্রির মধ্যে। পড়াও চললো মার। চোখ তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি। এণ্ড্রি বললো, আসছে রববার শহরে নিয়ে গিয়ে তোমায় চশমা কিনে দেব।

তিন তিনবার মা জেলে পেভেলের সংগে দেখা করতে গেছেন কিন্তু পারেননি। জেলের কর্তা অতিরিক্ত বিনয়ের সংগে, এখন হবেনা, এই আসছে হপ্তার, ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছে। মা এণ্ড্রিকে বললেন, খুব নম্র কিন্তু লোকটা।

এণ্ড্রি হেসে বললে, হাঁ, বিনয়ের অভাব নেই, হাসিরও অভাব নেই। ওদের যদি বলা হয়, দেখো এই লোকটা সাধু, ধ্যানী, কিন্তু ও থাকলে আমাদের বিপদ। ওকে ফাঁসিতে লটকাও। বাস, আর কথা নেই। ওরা হাসতে হাসতে তাকে ফাঁসিতে লটকাবে এবং ফাঁসিতে লটকিয়ে হাসতে থাকবে।

মা বললেন, কিন্তু আমাদের ওখানে যে লোকটি খানাতল্লাশী করতে গিয়েছিল সে একটু ·ল।

এণ্ড্রি বললো, মানুষ ওরা কেউই নয়, মা। মানুষকে আঘাত দেবার, অভিভূত করার, তাকে রাষ্ট্রের চাহিদা মতো গড়ে নেবার যন্ত্র ওরা, কর্তারা যেমন খুশি ওদের চালান। ওরা না ভেবে, কেন কি দরকার এ প্রশ্ন না ক'রে কর্তাদের হুকুম তামিল ক'রে যায়।

অবশেষে মা একদিন ছেলের দেখা পেলেন। অনেক কথা হলো। মা শেষটা বললেন, কবে ছেড়ে দেবে তোকে? কেন জেল হ'ল তোর? ইস্তাহার তো আবার বেরিয়েছে কারখানায়।

পেভেলের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, বেরিয়েছে? কবে? কতো?

রক্ষী বাধা দিয়ে বললো, ওসব কথা বলা নিষেধ, পারিবারিক কথা বলো।

অগত্যা পেভেল বললো, তুমি এখন কি করছ, মা?

মা ইংগিতপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, আমিই কারখানায় এইসব বয়ে নিয়ে যাই-টিক, ঝোল, খাবার—

পেভেল বুঝলো। চাপা হাসির বেগে তার মুখের শিরাগুলো কাঁপতে লাগলো। বললো, তা হলে একটা ভালো কাজ পেয়েছ তুমি, মা সময় তোমার মন্দ কাটছেনা।

মা বললেন, ইস্তাহার বেরুবার পর আমাকেও খুঁজে দেখেছিল।

রক্ষী বললো, আবার ঐ কথা।

এমনি করে সময় উত্তীর্ণ হল। মা ছেলে চোখের জলের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলেন, বিদায় নিলেন।

বাড়ি এসে মা এণ্ড্রিকে বললেন, আচ্ছা এণ্ড্রি, ওরা কেমন ক'রে পারে বলতো? আমার তো পেভেলের জন্য মুখে অন্ন রোচে না। আর ওরা ছেলেদের জেলে পাঠিয়ে দিব্যি আছে, খায় দায়, হাসি-গল্প করে। যেন কিছুই হয়নি।

এণ্ড্রি বললো, এইটেই তো স্বাভাবিক। আইন আমাদের ওপব যতটা কড়া, ওদের ওপর ততটা নয়। আর আমাদের চাইতে আইনের দরকারও ওদের বেশি। এইজন্যই আইন যখন ওদের নিজেদের মাথায় ঘা দেয়, ওরা কাঁদলেও জোরে কাঁদেনা—নিজের লাঠি নিজের মাথায় পড়লে তত লাগেনা। ওদের কাছে আইন রক্ষা-কর্তা, আর আমাদের কাছে আইন শৃংখল—যা আমাদের হাত-পা বেঁধে পংগু, দুর্বল ক'রে রেখেছে, আমাদের আঘাত দেবার শক্তি লোপ করেছে।

দিন তিনেক পরে নিকোলাই কারামুক্ত হয়ে পেভেলের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘরে আলো দেখতে পেয়ে সে এসে ঢুকলো, বললো, আমি সোজা জেল থেকে আসছি মা।

তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত, দৃষ্টি বিষণ্ণ, সন্দিগ্ধ। মা কোনদিনই তাকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু আজ ছেলেটির দিকে চেয়েও কেমন এক দরদে তাঁর প্রাণ ভরে গেলো, বললেন, শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেছিস যে বাবা। দাঁড়া, চা ক'রে দিচ্ছি।

এণ্ড্রি রান্নাঘর থেকে ব'লে উঠলো, আমিই করছি চা।

মা তখন বললেন, ফেদিয়া মেজিন কেমন আছে রে? কবিতা লিখছে, না?

নিকোলাই মাথা নেড়ে বললো, হাঁ, কিন্তু আমি ছাই কিছু বুঝিনা তা। একটা খাঁচায় রেখেছে তাকে, আর সে গান করছে। একটা জিনিস আমি খাটি বুঝেছি—আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।

মা সমবেদনার সুরে বললেন, ইচ্ছে থাকবে বা কেন। কিসের মায়ায় সে শূন্যপুরীতে যাবি?

নিকোলাই বললো, সত্যিই শূন্য পুরী, মা। শুধুই পোকা-মাকড়ের বাসা। এখানে আজকের রাতটা থাকতে পারি মা?

মা বললেন, ছেলে মার কাছে থাকবে তারও কি আবার অনুমতি নিতে হয় বাবা।

নিকোলাই আপন মনে কত কি ব'লে চললো। এণ্ড্রি রান্নাঘর থেকে আসতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললো, আমার মনে হয়, এমন কতকগুলো লোক আছে, যাদের মেরে ফেলা উচিত।

এণ্ড্রি গম্ভীরভাবে বললো, তাই নাকি। কিন্তু কেন শুনতে পারি কি?

যাতে তারা চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বটে। কিন্তু জ্যান্ত লোকগুলোকে ঠাণ্ডা করার অধিকার তোমায় কে দিলে?

দিয়েছে তারা নিজেরা। · তারা যদি আমায় আঘাত দেয়, আমার অধিকার আছে জবাবে তাদের আঘাত করার, তাদের চোখ উপ্‌ড়ে ফেলার। আমায় ছুঁয়ো না, আমিও তোমায় ছোঁব না। আমার যেমন খুশি চলতে দাও, আমি চুপ চাপ থাকবো, কাউকে ছোঁবও না। হয়তো বনে চ'লে যাবো, নদী-তীরে কুঁড়ে বেঁধে একা থাকবো।

এণ্ড্রি বললো, যাও না, খুশি হয় তাই গে থাকো।

এখন ? নিকোলাই ঘাড় নেড়ে বললো, এখন তা অসম্ভব।

কেন ? অসম্ভব কেন ? আটকাচ্ছে কে তোমায় ?

আটকাচ্ছে মানুষ। আ-মরণ তাদের সংগে জড়িয়ে থাকতে হ'বে আমায় —অন্যায় এবং ঘৃণায় বাঁধনে। শক্ত সে বাঁধন। আমি তাদের ঘৃণা করি, তাই তাদের ছেড়ে যাবোনা। তাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবো, তাদের জ্বালিয়ে মারবো আজীবন। তারা আমার শত্রুতা করেছে, আমিও তাদের শত্রুতা করব। কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয়, তো দেব আমার নিজের কাজের কৈফিয়ৎ। আমার বাবা যদি চোর হয়, বলতে বলতে থেমে গেলো নিকোলাই। তারপর হঠাৎ উচ্চ হ'য়ে ব'লে উঠলো, আইছে-গবর্ণর ব্যাটার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব, দেখে নিয়ো।

এণ্ড্রি ব্যগ্র কৌতূহলে বললো, কেন বলো তো ?

ব্যাটা স্পাই, লোকের সর্বনাশ ক'রে বেড়াচ্ছে। ব্যাটার জন্য আজ আমার বাবা পর্যন্ত স্পাই হবার মতলব করছেন।

এণ্ড্রি বুঝলো, নিকোলাইর প্রাণে কী মর্মন্তুদ ব্যথা, কী অসহ্য যাতনা —এর সান্ত্বনা নেই। যুক্তিতে এ প্রশমিত হয় না। শুধু বললো, ভাই, আমরাও ভুক্তভোগী, আমরাও এতদিন অম্‌নি ক'রে ভাঙা কাঁচ মাড়িয়ে রক্তাক্ত

পদে চলেছি জীবন-পথে, অন্ধকারে আমরাও অমনি আলোর জন্ত হা-হা করেছি।

নিকোলাই বললো, তুমি আমায় বোঝাতে চেয়ো না, বন্ধু, বোঝাবার কিছু নেই। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখো—মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধার্ত ক্রুদ্ধ নেকড়ের দল গর্জন করছে।

এণ্ড্রি বললো, একদিন এ দূর হ'বে—সম্পূর্ণভাবে না হ'লেও হ'বে। শিশুর হামের মতো এতো মানুষের একটা ব্যাধি। সবাই আমরা এতে ভুগি। যারা শক্তিমান তারা ভোগে বেশি। যারা দুর্বল, তারা ভোগে কম। এ ব্যাধি কখন আসে, জানো? যখন মানুষ নিজেকে চিনেছে, কিন্তু জীবনের পূর্ণ পরিচয় পায়নি, জীবন-যাত্রায় নিজের স্থান খুঁজে পায়নি। তা না পেয়ে নিজের দামও কষতে পারেনি। তখন তার কেবলই মনে হয়, দুনিয়ার বুকে অপূর্ব চিজ সে, কেউ তাকে মাপতে পারে না, কেউ তার দাম তলিয়ে দেখে না, সবাই চায় তাকে হজম ক'রে ফেলতে। পরে সে বুঝতে পারে, অন্যান্য বহু মানুষের মধ্যে যে প্রাণ তাও তারই মতো তখন থেকে তার মন নরম হ'তে থাকে, ব্যাধি উপশম হ'তে থাকে। লজ্জা জাগে, বোঝে যে, মন্দির-শির্ষে উঠে একা নিজের ঘণ্টাটি বাজিয়ে লোককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা বৃথা—মন্দিরের বড় ঘণ্টা তার ক্ষুদ্র ঘণ্টা-ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিয়ে বেজে উঠবে। বড় ঘণ্টার সংগে পাল্লা দিয়ে জাগতে হ'লে চাই ছোট ছোট ঘণ্টাগুলির একত্র সম্মিলন। আমি কি বলতে চাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছ নিকোলাই?

হাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করিনা।

* * *

খাবার এলো। খেতে খেতে এণ্ড্রি নিকোলাইকে বোঝাতে লাগলো, কারখানায় কেমন ভাবে সোশিয়ালিস্ট মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। নিকোলাই

সব শুনলো, তার মুখ আবার গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, বললো, বড্ডো ধীরে চলছে কাজ, বড্ডো ধীরে। আরও তাড়াতাড়ি হলে ভালো হয়।

এণ্ড্রি বললো, মানুষের জীবনটা তো ঘোড়া নয় নিকোলাই, যে চাবুক ক'ষে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

নিকোলাই সেই একসুরে বলতে লাগলো, কিন্তু বড্ডো ধীরে, ধৈর্য থাকে না আমার। কি করি, কি করি। তার অংগভংগীতে গভীর নিরাশা ফুটে উঠলো।

এণ্ড্রি বললো, আমরা করব জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান বিস্তার।

যুদ্ধ করব কবে? নিকোলাই সহসা প্রশ্ন করলো।

এণ্ড্রি হেসে বললো, যুদ্ধ কখন করতে হ'বে তা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, তার আগে আমাদের বহু প্রাণ আহুতি দিতে হবে, আর জানি যে, হাতের ছুরি শানাবার আগে শানাতে হবে মগজের বুদ্ধিকে।

এবং প্রাণকে—নিকোলাই যোগ করলো।

হাঁ, প্রাণকেও।

কিছু পরে নিকোলাই উঠে শুতে গেলো। মা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, ওর মনের মধ্যে কী একটা ভীষণ চক্রান্ত ঘুরছে এণ্ড্রি।

হাঁ মা, ওকে বোঝা বড়ো শক্ত, ব'লে এণ্ড্রিও বিছানায় গেলো। শুনতে পেলো, মা বলছেন, ভগবন্, পৃথিবীর যত মানুষ সবাই তো দেখছি কাঁদছে নিজ নিজ ব্যথায়। কোথায় মানুষ সুখী, কোথায় মানুষ আনন্দিত?

এণ্ড্রি বললো, আসছে মা, সে শুভদিন আসছে, যে-দিন মানুষ সুখী হ'বে, আনন্দিত হ'বে।

চোদ্দ

জীবন বয়ে চললো এমনি দ্রুত তালে। নিয়মিতভাবে মার ওখানে কর্মীরা মেলে, মতলব আঁটে, কাজ করে। মা কারখানায় ইস্তাহার ছড়ান,—ইস্তাহার বেরুবার পরদিন রক্ষীরা মাকে পরীক্ষা ক'রে বিফলকাম হয়। মার আরব্ধ ব্রতের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ে।

নিকোলাইর কারখানায় কাজ গেছে, এখন কাজ করে এক কাঠের গোলায়, আর রোজ মার ওখানে মজলিশে যোগ দেয়। সবাই চলে যাবার পরও সে থাকে। একা এণ্ড্রির মুখোমুখি বসে প্রশ্ন করে, কিন্তু মানুষ যে আজ সর্বহারা, তার জন্য সব চেয়ে বেশি দায়ী কে?—কার?

এণ্ড্রি বলে, দায়ী সেই, যে প্রথম উচ্চারণ করেছিল, 'এই আমার জিনিস।' কিন্তু সে লোকটা মারা গেছে বহু হাজার বছর—তার ওপর রাগ ঝাড়বার উপায় নেই।

কিন্তু ধনী আর তাদের মুরুব্বীরা—তাদের কথা কি বলছ? তারা কি নির্দোষ?

এণ্ড্রি তার জবাবে বহু যুক্তিপূর্ণ কথা বলে,—নিকোলাইর মন প্রসন্ন হয় না। সাধারণ মানুষও যে সব দোষের সংগে জড়িত, একথাটা তার মন মানতে চায় না। একদিন সে বললো, দুনিয়া থেকে ঐ দুষ্ট আগাছাগুলোকে নির্দয়ভাবে চষে ফেলতে হ'বে আমাদের।

মা বললেন, আইছেও এমনি কথা বলেছিল।

স্পাই আইছের নাম শুনে মুহূর্তে নিকোলাইর মন কঠিন হ'য়ে উঠলো।

এণ্ড্রি বললো, সত্যিই আইছে বড় বেড়েছে মা। রাতদিন ও লোকদের

ধরিয়ে দেবার মৎলবে ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরছে। নিকোলাই একদিন ওকে ধ'রে আচ্ছা মতো দিয়ে দিবে। কর্তারা জনসাধারণের মন কী পর্যন্ত বিষিয়ে তুলেছে দেখ। নিকোলাইর মতো লোকের যখন অন্যায়ের অত্যাচারে ধৈর্য হারাবে, তখন কী ভীষণ ব্যাপার হবে! পৃথিবী হবে রক্ত-রঞ্জিত, আকাশেও যেয়ে সে রক্তের ছোপ লাগবে।

একদিন অকস্মাৎ পেভেল এসে হাজির হ'ল। মার বুক আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। মা এণ্ড্রিকে ডাকলেন। তিন জনে প্রাণ খুলে কথা বলতে লাগলো। মা খাবার নিয়ে এলেন। খেতে খেতে এণ্ড্রি রাইবিনের কথা তুললো। পেভেল বললো, আমি থাকলে যেতে দিতুম না। কি সম্বল ক'রে বেরুলো সে?—অসন্তোষ এবং অজ্ঞানান্ধকার।

এণ্ড্রি হেসে বললো, চল্লিশ বছর অবিরত সংগ্রাম করার ফলে অন্তর যার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তাকে বাগ মানানো সোজা নয় বন্ধু।

পেভেল কঠিন স্বরে বললো, কেন, তুমি কি মনে কর, জ্ঞান মানুষের মনের পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি দূর করতে পারে না?

এণ্ড্রি অর্থপূর্ণ ভাষায় বললো, একলাফে একেবারে আকাশে উঠতে যেয়ো না পেভেল, স্বর্গের চূড়ায় ঘা খেয়ে ডানা ভেঙে যাবে।

তারপর চললো দুই বন্ধুতে বিতর্ক। মা তার একবর্ণও বুঝতে পারছেন না, শুধু বুঝলেন, পেভেল চাষাদের কথা ভেবে তাদের জন্য নির্ধারিত পন্থার একচুল এদিক-ওদিক যেতে রাজি নয়। এণ্ড্রি চাষাদের পক্ষে, বলে, তাদেরও শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হ'বে। এর মধ্যে এণ্ড্রির মতই মার মনে লাগে। এমনি করে খাওয়া শেষ হয়, দিন কাটে।

পনেরো

মে মাসে মজুরদের একটা উৎসবের আয়োজন হ'ল। বন্দী মজুরেরা সবাই জেল থেকে ফিরে এসেছে। উৎসবের ধরণ সম্বন্ধে দু'দলের দু'মত। একদল বলে, সশস্ত্র হ'য়ে মজুরদল বেরিয়ে পড়ুক ; আর একদল বলে, না। মজুরেরা দলে দলে নিশান হাতে সাম্য মন্ত্র ধ্বনিত ক'রে শোভাযাত্রা করুক। শেষোক্ত দলই ভারি। আইভানোভিচ্ বললো, বন্ধুগণ, বর্তমানের এই ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া একটা মহান কাজ, কিন্তু তার জন্য সব্বার প্রথমেই চাই আমার এক জোড়া ওভার-সু, এই ছেঁড়া জুতোর বদলে, কারণ এই ওভার-সু সোসিয়ালিজমের জয়-যাত্রায় আমাদের সব চেয়ে বেশি কাজে লাগবে। এই পুরাণো ব্যবস্থাকে খোলাখুলি উল্‌টে ফেলে না দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে একপাও যেতে চাই না আমি তাই তো বলি, অস্ত্র এখন থাক।

মা তাদের বাদানুবাদ শুনতেন। তাদের মুখেই শুনলেন তিনি, একদল লোক, যাদের বলে বুর্জোয়া, তারাই জনসাধারণের শত্রু। জার যখন ছিলেন, তখন জনসাধারণকে ক্ষেপিয়েছে জারের বিরুদ্ধে, তারপর জনসাধারণ যখন জারকে সরিয়েছে সিংহাসন থেকে, তখন তারা ছলা-কলায় শক্তি আত্মসাৎ ক'রে জনসাধারণকে কোণ-ঠ্যাসা ক'রে রেখেছে,—জনসাধারণ এর প্রতিবাদ করলে তাদের হত্যা করেছে শতে শতে, সহস্র সহস্র মানুষকে চিবিয়ে, পিষে পিষে, চুষে মারছে তারা। এই বুর্জোয়াদল · এই ধনীদল · সোনার ভারে প্রাণ এদের চাপা পড়ে গেছে। এরা মানবজাতির নিষ্ঠুরতম শত্রু, প্রধানতম প্রবঞ্চক, সর্বাপেক্ষা উগ্র বিষ-পতংগ।

শশেংকাও আসে প্রায়ই। মা একদিন আড়াল থেকে শুনতে পেলেন, পেভেল আর সে কথা বলছে।

তুমিই নিশান ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছ ?

হাঁ।

ঠিক হ'য়ে গেছে ?

হাঁ, আমিই এর অধিকারী।

অর্থাৎ আবার তুমি জেলে যাবে। এ কি সম্ভব হ'ত না

কি ?

যে, আর কেউ নিশান ব'য়ে নিয়ে যেতো ?

না।

একবার ভেবে দেখ, কত প্রভাব তোমার। সবাই তোমায় কত পছন্দ করে। তোমার আর নখোদ্‌কার মতো নামজাদা বিপ্লবপন্থী আমাদের মধ্যে আর নেই। একবার ভেবে দেখ, মুক্তিকল্পে কত কি করার শক্তি আছে তোমার। তাই তো তোমাকে পেলে তারা ছাড়বে না, দীর্ঘকালের জন্য দূরে সরিয়ে ফেলবে তোমায়।

না শশা, আমি সংকল্প করেছি, কোন-কিছুই সে সংকল্প হ'তে আমায় টলাতে পারবে না

পারবে না ? যদি আমি অনুরোধ ক'রে বলি, পেভেল

এমন অনুরোধ তোমার করা উচিত নয়, শশা।

উচিত নয় ! পেভেল, আমি মানুষ, রক্ত-মাংসধারী মানুষ।

শুধু মানুষ নও, অতি-মানুষ। তাইতো তোমাকে আমি ভালোবাসি এবং জানি তুমি অমন অনুরোধ করতে পারো না।

তবে যাও পেভেল ব'লে শশা তাড়াতাড়ি চ'লে গেলো।

মার মন আবার আশংকায় দুলে উঠলো। পেভেলের সংগে দেখা হ'লেই জিগ্যেস করলেন, পয়লা মে আবার কি করতে চাস ?

পেভেল বললো, নিশান হাতে শোভা-যাত্রা চালিয়ে নিয়ে যাবো। এতে জেল হ'বে ব'লেই মনে হয়।

মার চোখ সজল হ'য়ে এলো। পেভেল মার হাত ধরে বললো, আমায় এ করতেই হবে মা। এতেই আমার সুখ, তুমি কি এতে বাধা দেবে মা ?

না, বাধা দেবো না—মা ধীরে ধীরে বললেন।

তাঁর বিষণ্ণ দৃষ্টি পেভেলের চোখ এড়ালো না, বললো, দুঃখ করো না মা, এতে তো আনন্দ করা উচিত। কবে আমাদের দেশে তেমন মা হবে, যাঁরা হাসিমুখে ছেলেদের মৃত্যুর মুখে তুলে দেবেন ?

এণ্ড্রি চিমটি-কাটার মতো ক'রে বললো, ওহে একটু আস্তে আস্তে চালাও

মা বললেন, না তোমায় আমি বাধা দেবো না পেভেল, কিন্তু কান্না এ আমি কেমন ক'রে রোধ করব আমি যে মা

এক রকমের ভালোবাসা আছে, যা মানুষের সমস্ত জীবনটাকে মাটি করে দেয়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এই কথা ব'লে পেভেল মার কাছ থেকে স'রে গেলো।

মা কেঁপে উঠলেন। পেভেল পাছে আরো এমনি নিষ্ঠুর আঘাত দেয়, সেই আশংকায় তিনি বললেন, বাধা দেবো না পেভেল, বাধা দেবো না। আমি বুঝি বুঝি, সংগীদের জন্য আজ তোকে একাজ করতেই হবে।

পেভেল বললো, সংগীদের জন্য নয়, তাদের জন্য হ'লে না ক'রেও পারতুম, এ আমার নিজের জন্য দরকার।

মা চ'লে গেলেন। এণ্ড্রি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো, এবার এগিয়ে এসে মায়ের ওপর পেভেলের অনাবশ্যক রূঢ়তার প্রতিবাদ করলো,

বললো এমন স্নেহময়ী মায়ের ওপর এমন আস্ফালন করার কোনই দরকার ছিল না, ওর এক কাণাকড়িরও কদর নেই।

পেভেল নিজের ভুল বুঝতে পেরে মার কাছে ক্ষমা চাইলো, অবুঝ ছেলেকে ক্ষমা করো মা।

মা ছেলের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন, যা দরকার তা করিস বাবা, শুধু বুড়ো মাকে কাঁদাসনি।

এণ্ড্রিকে ডেকে বললেন, ও তোর অবুঝ ছোট ভাই, ওকে বকিসনি, বাবা।

এণ্ড্রি বললো, শুধু বকা! হতভাগাকে ধ'রে একদিন আচ্ছা মতো দিয়ে তবে ছাড়বো।

না বাবা, না বাবা, ব'লে মা এণ্ড্রির হাত ধরলেন।

এণ্ড্রি তখন বললো, তুমি পাগল হয়েছ মা, আমি পেভেলের গায়ে হাত দোব। আমি ওকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি দেখতে পারি না হতভাগাকে। নতুন জামা পরেছেন উনি, তাই গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না। যাকে পায়, তাকেই ঠেলা দিয়ে বলে, দেখ কেমন জামা পরেছি। জামাটা ভালো, কিন্তু হ'ক ভালো, তাই ব'লেই কি লোককে এমনি করে ঠেলতে হ'বে? বুলে, এমনিতেই মানুষ হ'য়ে আছে অতিষ্ঠ।

পেভেল হেসে বললো, কতক্ষণ মুখ চালাবে আর? কম তো বাক্যবাণ নিক্ষেপ করনি।

এণ্ড্রি মেঝের উনুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে ছিলো। পেভেল নুয়ে পড়ে তার হাত জড়িয়ে ধরলো। তার কিছুক্ষণ পরেই দু'ভাইয়ের মতোই তারা আলিংগনাবদ্ধ হ'ল। দেখে মার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠলো। তারপর

যেন লজ্জিত হ'য়ে বললেন, মেয়ে মানুষের চোখের জল, দুঃখেও ঝরে, সুখেও ঝরে।

পেভেল বললো, এ চোখের জলে লজ্জিত হবার কিছু নেই, মা।

এণ্ড্রি বললো, গর্ব করা উচিত নয়, কিন্তু সত্যিই আমরা এক নব-জীবনের আস্বাদ পাচ্ছি এখন। এ জীবন খাঁটি, মনুষ্যোচিত, প্রেমে, মংগলে পরিপূর্ণ।

পেভেল মার দিকে চেয়ে বললো, হাঁ।

মা বললেন, জীবনের ধারা যেন বদলে গেছে। আজ এসেছে নতুন বকমেব দুঃখ, নতুন ধরণের আনন্দ। তা যে কী, তা জানি না, বুঝি না, ব্যক্তও করতে পারিনা ভাষায়।

. এণ্ড্রি বলল, এই তো হওয়া উচিত। দুনিয়ার দিকে নজর ক'রে দেখো মা, একটা নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে, একটা নতুন প্রাণ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এতকাল সকল প্রাণ ছিল স্বার্থের সংঘাতে নিপীড়িত, অন্ধ-লোভে জর-জর, হিংসা-বিদ্বেষে ভারাক্রান্ত, মিথ্যা-ভীরুতা-হীনতায় দূষিত, রোগজীর্ণ, শংকিত-জীবন, কুহেলির যাত্রী, নিজের ব্যথাভারে ক্রন্দনোম্মুখ,—হঠাৎ তারই মধ্য থেকে জেগে উঠেছে এক নতুন মানুষ, যুক্তির আলোকে জীবনকে সে আলোকিত করেছে। মানুষকে ডেকে বলছে, ওগো পথ-ভ্রান্ত বন্ধুদল, আজ দিন এসেছে এ সত্য উপলব্ধি করার যে, তোমাদের সবার স্বার্থ এক, তোমাদের প্রত্যেক মানুষের বাঁচবার দরকার আছে, বাড়বার দরকার আছে। আজও সে একা, তাই কণ্ঠস্বর তার এতো তীব্র। তার আহ্বানে খাঁটি কর্মীরা একপ্রাণ হ'য়ে দাঁড়ায়, বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে নব বাণী, হে আমার দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, তোমরা মিলিত হ'য়ে এক মানব-গোষ্ঠি গঠিত কর। তোমাদের জীবনের প্রসূতি প্রেম—ঘৃণা নয়।

আমি শুনতে পাচ্ছি, বিশ্বময় আজ সেই বাণীই প্রতিধ্বনিত রাতে বিছানায় শুয়ে একা জেগে সর্বত্র এই বাণী শুনি, আর প্রাণ নেচে নেচে ওঠে। দুঃখ অন্যায়ের ভারে প্রপীড়িতা এই ধরণিও সে আহ্বানে সাড়া দেয়, কেঁপে কেঁপে ওঠে, আর মানুষের হৃদয়াকাশে উদিত নবারুণকে সংবর্ধিত করে।

পেভেল তাকে কি বলতে যাচ্ছিল, মা বাধা দিয়ে বললেন, ওর কথা শেষ করতে দে।

দীপ্তোজ্জ্বল চক্ষু তুলে এণ্ড্রি বললো, কিন্তু জানো এখনো অনেক দুঃখ সইতে হবে মানুষকে, লোভের হাতে এখনো তার অনেক রক্তপাত হ'বে, কিন্তু আমাদের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত রক্তও কম মূল্যবান মনে হ'বে তার কাছে, যা আমরা এরি মধ্যে পেয়েছি উদ্বেল বক্ষে, চঞ্চল মনে, শিরায় শিরায়। তারা যেমন সোনার আলোকে ধনী, আমিও তেমনি ধনী হয়েছি। সমস্ত বোঝা আমি বইব, সমস্ত দুঃখ আমি সইব, কারণ প্রাণে আমার সেই আনন্দের সাড়া পেয়েছি, যা কেউ কোনো-কিছুতে চেপে রাখতে পারে না। এই আনন্দের মধ্যে নিখিল শক্তি নিহিত।

নব-জীবনকে এমনিভাবে অভিনন্দিত করতে লাগলো তারা।

ষোল

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই কর্স্নোভা ছুটে এলো, শীগগির এসো, আইছেকে কে খুন করেছে।

শুনেই মার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। আততায়ী ব'লে চকিতে একজনকে তিনি সন্দেহ করলেন। বললেন—কে খুন করলো ?

খুনী কি এখনো সেখানে ব'সে আছে ?

কর্স্নোভা বললো, ভাগ্যিস্ তোমরা সবাই বাড়ি ছিলে ? আমি দুপুর রাতে জান্লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে গিয়েছিলুম।

মা ভীত হ'য়ে বললেন, কি বলছ তুমি ? আমরা খুন করেছি, একথা কারু স্বপ্নেও মনে আসতে পারে ?

পারে। তোমরা ছাড়া মারবে কে। তোমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতো সে, এ তো রাজ্যসুদ্ধ লোক জানে।

মার মনে আবার নিকোলাইর কথা জেগে উঠলো।

কারখানার দেয়ালের অদূরে লোকের ভিড—সেখানে আইছের মৃতদেহ। রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। স্পষ্ট বোঝা যায়, কেউ গলা টিপে মেরেছে।

একজন ব'লে উঠলো, পাজী ব্যাটার উচিত শাস্তি হয়েছে।

কে—কে বললো একথা, ব'লে পুলিশরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো শবের কাছে। লোকেরা ছুটে পালালো। মাও বাড়ি চ'লে এলেন। একটু, পেভেল বাড়ি এলে জিগেস করলেন, কাউকে ধরেছে ?

শুনিনি তো, মা।

নিকোলাইর কথা কিছু বলছে না ?

না। এ ব্যাপারে তার কথা কেউ ভাবছেই না। সে কাল নদীতে গেছে, এখনো ফেরেনি।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

খেতে ব'সে চামচে রেখে পেভেল হঠাৎ ব'লে উঠলো, এইটেই আমি বুঝি না।

কি?—এণ্ড্রি বললো।

পেভেল বললো, উদরপূরণ করার জন্য যে হত্যা, তা অত্যন্ত বিশ্রী। হিংস্র জানোয়ারকে হত্যা—হাঁ, তা বুঝতে পারি, মানুষ যখন হিংস্র পশুতে পরিণত হ'য়ে মানবজাতির ওপর অত্যাচার করতে যায়, তাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করতে পারি। কিন্তু এইরূপ ঘৃণ্য, তুচ্ছ কীটকে হত্যা করা—আমি বুঝি না, কেমন ক'রে এ কাজে মানুষের হাত ওঠে।

এণ্ড্রি বললো, কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের চাইতে সে বড় কম ছিল না।

তা জানি।

আমরা মশা মারি যৎসামান্য রক্ত সে খায়, তা জেনেও।

পেভেল বললো, আমি ও-সম্বন্ধে কিছুই বলছিনা। শুধু বলছি এ অত্যন্ত ছোট কাজ।

এণ্ড্রি বললে, কিন্তু ও ছাড়া কি করতে পারো তুমি?

পেভেল বহুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললো, তুমি পারো অমনভাবে একটা মানুষকে খুন করতে?

এণ্ড্রি দৃঢ়কণ্ঠে বললো, নিজের জন্য কোনো জীবিত প্রাণীকে আমি ছোঁবও না; কিন্তু ব্রত-সিদ্ধির জন্য, বন্ধুদের হিতার্থে আমি সব-কিছু করতে পারি—এমন কি তার সর্বনাশ সাধনও করতে পারি—নিজের ছেলের পর্যন্ত

মা শিউরে বললেন, কি বলছ বাবা!

এণ্ড্রি হেসে বললো, সত্যিই বলছি মা, এ আমরা করতে বাধ্য এই আমাদের জীবন।

পেভেল চুপ ক'রে রইলো। এণ্ড্রি হঠাৎ যেন কি এক ভাবের প্রেরণায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, মানুষ কি ক'রে একে ঠেকিয়ে রাখবে? মাঝে মাঝে, অবস্থার ফেরে প'ড়ে বাধ্য হ'য়ে এক-একটা মানুষের ওপর এমন কঠোর হ'য়ে উঠ্‌তে হয়, সেই নবযুগকে আহ্বান ক'রে আনার জন্য, যখন মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'বে, পরস্পরের সংগে প্রেমের সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়ার। জীবনের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন যারা, নিজেদের শান্তি এবং সম্মানের খাতিরে মানুষকে বিক্রয় ক'রে যারা অর্থ সঞ্চয় করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমার দাঁড়ানো চাই-ই। সাধু লোকদের পথে দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের সর্বনাশ করতে চায় যে জুডাস, তাকে বাধা না দিলে আমিও জুডাসের মতো অপরাধী হবো। এ পাপ? এ অন্যায়? আমি জিগ্যেস করি, ঐ যে কর্তারা—ওরা কোন্ অধিকারে সৈন্য রাখে? জল্লাদ রাখে? কারাগার, দণ্ডনীতি, ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের সুখ-সুবিধা নিরাপত্তার পথ খোলসা করে? যদি কখনো এমন হয় যে, তাদের দণ্ড দেবার ভার আমি তুলে নিতে বাধ্য হই, তখন আমি কি করব? হাঁ, আমি নেবো ওদের দণ্ড, ভয় খাবো না। ওরা মারে আমাদের শ'তে শ'তে। আমারও অধিকার আছে হাত তোলার,—সব চেয়ে কাছে যে শত্রু, সব চেয়ে যে বাধা জন্মায় তাকে আঘাত করার। এই হচ্ছে যুক্তি, কিন্তু তবু আমি স্বীকার করি, ওদের মারা নিষ্ফল—বৃথা রক্তপাত। সত্য জন্মায় একমাত্র আমাদের নিজেদের বুকের রক্ত-ভেজা জমিনে। আমি জানি তা, কিন্তু

এ পাপ করব,—দরকার যখন হ'বে তখন নির্মম হ'বো। আমি একমাত্র আমার কথাই বলছি। আমার মৃত্যুর সংগে সংগে এ পাপ মুছে যাবে, ভবিষ্যতের গায়ে তার কোনো চিহ্ন থাকবে না, আর কারুর নাম এতে কলংকিত হ'বে না।

এণ্ড্রি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো ঘরময়। তারপর বললো, জয়-যাত্রার পথে এমন অনেক সময় হ'বে যখন তোমার নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'বে নিজেকে, তোমার প্রাণ, তোমার যথা-সর্বস্ব ত্যাগ করতে হ'বে। প্রাণ দেওয়া, ব্রতকল্পে জীবন উৎসর্গ করা—সেতো সোজা। আরো চাই, আরো দাও। তাই দাও, যা তোমার জীবনের চাইতেও প্রিয়। তখনই তুমি দেখবে, জীবনের প্রিয়তম বস্তু যে সত্য, তার অদ্ভুত জীবনী-শক্তি।

ঘরের মাঝখানে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর চোখ আদ্দেক বুঁজে বিশ্বাস-দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগলো আবার, এমন সময় আসবে জানি, যখন মানুষ মানুষের সাহচর্যে আনন্দ পাবে, যখন নক্ষত্রের মতো একে অন্যকে আলো দেবে, যখন মানুষ মাত্রের কানে বাজবে মানুষের কথা সংগীতের মতো। মানুষ হ'বে সেদিন মুক্তিতে মহান, খোলা প্রাণে ঘুরবে ফিরবে তারা। হিংসা থাকবে না, বিদ্বেষ থাকবে না, লোভ থাকবে না, মানুষের বুদ্ধি অবজ্ঞাত হ'বে না। জীবন হ'বে মানুষের সেবা। মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উঠবে—কারণ তখন সে মুক্ত। তখন আমরা জীবন কাটাব সত্যে, স্বাধীনতায়, সৌন্দর্যে। তখন তারাই হ'বে তত শ্রেষ্ঠ, যারা যতো বেশি প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতে পারে, মানুষকে যত বেশি ভালোবাসতে পারে। সব চেয়ে মুক্ত যারা, তারাই হ'বে সব চেয়ে মহান্, সব চেয়ে সুন্দর। তখন গৌরবমণ্ডিত হ'বে জীবন,—গৌরবমণ্ডিত হ'বে জীবনের অধিকারী মানুষদল, এই জীবনের জন্য আমি সব-কিছু করতে

প্রস্তুত। 'দরকার' হ'লে আমি নিজ হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনবো, নিজ পায়ে তা দলিত করব। উত্তেজনায় এণ্ড্রি কাঁপতে লাগলো।

পেভেল মৃদুকণ্ঠে জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে তোমার এণ্ড্রি ?

শোনো, আমিই তাকে খুন করেছি।

পেভেল বুঝলো, তাই এণ্ড্রি আজ এতো চঞ্চল। এণ্ড্রির জন্ত সহানুভূতিতে তার বুক ভ'রে গেল। মাও এই ব্যথিত ছেলেটিকে স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইলেন।

এণ্ড্রি বললো, তাকে কেন খুন করলুম জানো ? সে আমায় অপমান করেছিল—মানুষের পক্ষে চরম অপমান; এমন অপমান করতে আমায় কেউ কখনো সাহস করে নি। আমি কারখানার দিকে যাচ্ছি, সে আমার পিছু নিয়ে বলতে লাগলো, আমাদের সবার নামই নাকি পুলিশের খাতায় আছে; পয়লা মের আগে সবাইকে শ্রীঘরে যেতে হ'বে। আমি কোনো জবাব দিলুম না, হাসলুম, কিন্তু রক্ত আমার টগ্ বগ্ ক'রে ফুটে উঠলো। তারপর সে বললো, তুমি চালাক লোক এ পথে না চ'লে তোমার উচিত আইনের কাজে প্রবেশ করা, অর্থাৎ গোয়েন্দা হওয়া ওঃ, কী অপমান, পেভেল। এর চাইতে মুখের ওপর ঘুষি মারলো না কেন সে। তাও হয়তো সইতে পারতুম। কিন্তু এ অসহ্য। মাথায় খুন চেপে গেলো। পেছন দিকে এক ঘুষি চালালুম তারপর চ'লে গেলুম। ফিরে তাকালুম না, শুনলুম, সে ধপ ক'রে পড়ে গেলো নিরবে। মারাত্মক যে কিছু হয়েছে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি শান্তভাবে চ'লে গেলুম, যেন আর কিছু করিনি, একটা ব্যাঙকে লাথি মেরে পথ হ'তে সরিয়ে রেখেছি। তারপর কাজ করতে করতে শুনলুম, আইছে খুন হয়েছে। আমার কথাটা এমন কি বিশ্বাসও হ'ল না—কিন্তু হাত যেন কেমন অসাড় হ'য়ে এলো

…এ পাপ নয় আমি জানি, কিন্তু এ নোঙরা কাজ—সমস্ত জীবনেও যার কালিমা আমি ধুয়ে ফেলতে পারব না।

পেভেল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললো, তা এখন কি করতে চাও এণ্ড্রি ?

কি করব ? আমি খুন করেছি, এ কথা কবুল করতে ভয় খাই না আমি। কিন্তু লজ্জা হয় এমন একটা তুচ্ছ কাজ ক'রে জেলে যেতে লজ্জা হয়। কিন্তু অন্য কেউ যদি এর জন্য অভিযুক্ত হয়, তাহ'লে আমি গিয়ে ধরা দেবো ; নইলে যেমন আছি তেমনই থাকবো।

সেদিন কেউ আর কাজে গেলো না। পেভেল আর মা এণ্ড্রির কথাই বলতে লাগলো। পেভেল বললো, এই তো দেখ মা আমাদের জীবন। এমনভাবে আমরা আছি পরস্পর সম্পর্কে যে ইচ্ছে না থাকলেও আঘাত করতে হয়। কাদের ? ঐ সব ঘৃণ্য নির্বোধ জীবদের সৈন্য, পুলিশ, গোয়েন্দাদের যারা আমাদেরই মতো মানুষ, কিন্তু যাদের রক্ত আমাদেরই মতো শোষিত হচ্ছে অহর্নিশ, যারা আমাদেরই মতো মানুষ হ'য়েও মানুষ ব'লে গণ্য হচ্ছে না। কর্তারা একদল লোকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন আর একদল লোক ভয়ে তাদের অন্ধ ক'রে রেখেছেন হাত-পা বেঁধে নিঙরে শুষে নিচ্ছেন তাদের রক্ত এক দলকে দিয়ে আর এক দলকে করছেন আঘাত। মানুষকে আজ তারা পরিণত করেছেন অস্ত্রে, আর তার নাম দিয়েছেন সভ্যতা।

তারপর কণ্ঠ আরও দৃঢ় ক'রে বললো, এ পাপ, মা। লক্ষ লক্ষ মানুষকে, লক্ষ লক্ষ আত্মাকে হত্যা করার জঘন্য পাপ। হাঁ, আত্মাকে হত্যা করে তারা। তাদের আমাদের তফাৎ দেখো মা। এণ্ড্রি না বুঝে খুন ক'রেও কেমন বিষণ্ণ, লজ্জিত, অস্থির হ'য়ে পড়েছে। আর তারা ? হাজার হাজার খুন ক'রে যাবে শান্তভাবে—একটু হাত কাঁপবে না, দয়া হবে না, প্রাণ শিউরে

উঠবে না। তারা খুন করবে আমোদের সংগে, আনন্দের সংগে। কেন জানো মা? তার সবাইকে—সমস্ত-কিছুকে টুটি টিপে ধরে মারে শুধু ওদের বাগান-বাড়ি, আসবাব-পত্র, সোনা-রূপা, কোম্পানীর কাগজ এবং লোককে দাবিয়ে রাখার যত-কিছু সাজ-সরঞ্জাম নিরাপদ রাখতে। ওরা খুন করে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে নয়—ওদের সম্পত্তি বাঁচিয়ে রাখতে। এই অন্যায়, এই অপমান, এই নোংরামি এই-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আমরা যে সত্য নিয়ে লড়াই কর্ছি তা কত বড়, কত গৌরবময়।

বাইরে লোকের পায়ের শব্দ হ'ল। দু'জনে চমকে চাইলেন, পুলিশ নয় তো!

সতেরো

দোর খুলে ঢুকলো রাইবিন।

রাইবিন সেই যে শহর ছেড়ে বেরুলো সত্যপ্রচারে—আড্ডা গাড়লো গিয়ে এডিলজেভ ব'লে এক গ্রামে। যাবার সময় সে মেলাই গরম গরম বই ও ইস্তাহার নিয়ে গিয়েছিল,—তাই দিয়ে সে সত্য প্রচার করতো। বইগুলোর বেশ চাহিদা ছিল। আরো বইয়ের দরকার বলে রাইবিন ইয়াফিম ব'লে এক ব্যবসারীর সংগে শহরে এসেছে।

পেভেল রাইবিনকে সানন্দে অভ্যর্থনা করলে।

রাইবিন সেই ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীই আছে। কর্তাদের ওপর, বুর্জোয়াদের ওপর আজো সে তেমনি চটা। কথাপ্রসংগে বললো, আমার বেশ সুবিধা আছে,

নিষিদ্ধ বই ছড়াবো, আর পুলিশ টের পেলে ধরবে ও-অঞ্চলে' দু'জন শিক্ষককে, আমায় সন্দেহ করতে পারবে না।

পেভেল ব'ললো, কিন্তু এটাতো উচিত নয়, রাইবিন্।

কোনটা ?

তুমি কাজ করবে, আর তার দুখ ভোগ করবে অন্যে।

রাইবিন জবাব দিলো, তুমি ভুল বুঝেছো পেভেল। প্রথমত শিক্ষকরা বুর্জোয়া, তাদের কোনো ভয় নেই। কর্তারা শাস্তি দেবেন যে-সব পল্লিবাসীর কাছে বই পাবেন, তাদেরই। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের বইয়েতে কি নিষিদ্ধ কথা কিছু নেই ? আছে, তবে তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা, আমার বইয়ের মতো সোজা খোলাখুলি লেখা নয়। তৃতীয়ত, বুর্জোয়াদের সংগে বনিবনাও ক'রে চলতে চাই না আমি। পায়ে যে হাঁটছে তার কি সাজে ঘোড সওয়ারের বন্ধুত্ব করা ? সত্য কথা বলতে কি, ওদেব এই গায়ে পড়ে দেশের কাজ করাটাকে আমি দস্তুরমতো সন্দেহ করি। ওদের উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় খুব সাধু নয়। তাই ওরা বিপদে পড়লে আমি দুঃখিত হব না। সাধারণ পল্লিবাসীর ওপর অবশ্য এ রকমটা করতুম না।

মা বললেন, কিন্তু কর্তাদের মধ্যেও এমন দু'চারজন আছেন, যারা আমাদের জন্য প্রাণ দেন।

রাইবিম বললো, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বেশির ভাগের সংগেই আমাদের অহি-নকুল সম্পর্ক। আমরা 'হাঁ' বললে, ওরা বলবে 'না'। আর আমরা 'না' বললে, ওদের 'হাঁ' বলা-ই চাই—আমরা পেট ভরে খেলে, ওদের ঘুম হয় না, এই ওরা। পাঁচ বছর ধরে আমি শহরে শহরে কারখানায় কারখানায় ঘুরেছি, তারপরে গেলুম গ্রামে—কিন্তু গিয়ে যা দেখলুম, তাতে বুঝলুম, আর এমন করে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তোমরা শহরে থাকো, ক্ষুধা

কি জানো না, অত্যাচার কি প্রত্যক্ষ কর না। কিন্তু গ্রামে সমস্ত জীবন ক্ষুধা মানুষের সংগী হয় ছায়ার মতো—ক্ষুধা মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে—তার আকৃতি থেকে মানুষের ছাপ লোপ ক'রে দেয়। মানুষতো গ্রামে বেঁচে নেই, তারা অপরিহার্য অভাবে প'চে মরছে, আর তাদেরই চারিদিকে কর্তারা শ্যেন-দৃষ্টি বিস্তার করে বসে আছে—একটি টুকরোও যাতে তাদের মুখে এসে না পড়ে—পড়লে, যাতে তাদের মুখে ঘুষি মেরে তারা তা ছিনিয়ে নিতে পারে।

রাইবিন চারিদিকে চাইলো, তারপর পেভেলের দিকে নুয়ে পড়ে টেবিলের ওপর হাত রেখে বলতে লাগলো, এমনি জীবন দেখে গা আমার রি-রি করে উঠলো—ইচ্ছে হ'ল ছুটে শহরে চলে যাই। কিন্তু গেলুম না, গ্রামে রইলুম। কর্তাদের চর্বচোষ্য যোগাবার জন্য নয়,—তাদের সংগে বোঝাপড়া করতে। মানুষেব ওপর অনুষ্ঠিত এই অন্যায়, এই অত্যাচারের জ্বালার বাহন আমি—শাণিত ছুরিকার মতো এই অন্যায় অহর্নিশ আমার প্রাণে কেটে কেটে বসছে। আমার সাহায্য কর পেভেল—এমন বই দাও, যা প'ড়ে মানুষ আর স্থির থাকতে পারবে না—তার মাথার মধ্যে আগুন জ্ব'লে উঠবে, এমন সত্য আজ তাদের শিক্ষা দাও যা গ্রামকে উত্তপ্ত ক'রে তুলবে, যা শুনে মানুষ মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারপর হাত তুলে প্রত্যেকটা কথার ওপর জোর দিয়ে বলতে লাগলো, মৃত্যু আজ শোধ করুক মৃত্যুর ঋণ—মৃত্যু আজ উদ্বুদ্ধ করুক নবজীবন। সহস্র সহস্র প্রাণ আজ উৎসর্গীকৃত হ'ক বিশ্বমানবকে নবভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য। এই চাই। শুধু মরা নয়—সে তো সোজা। চাই নবজীবন, চাই বিপ্লব।

মা চা নিয়ে এলেন। পেভেল বললো, বেশতো, মাল-মশলা দাও, পাড়াগাঁর জন্যও আমরা একটা কাগজ বের করছি।

দেবো, যতদূর সম্ভব সোজা ভাষায় লিখো একটা ছোট ছেলেও যেন বুঝতে পারে।

তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলো, আহা, যদি ইহুদী হতুম আমি। খৃস্টান সাধুরা অপদার্থ ইহুদী প্রফেটরা এমন ভাষায় কথা কইতে পারতো, যা শুনলে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। তারা গির্জায় বিশ্বাসী ছিল না, ছিল আত্ম-বিশ্বাসী। তাদের ভগবান ছিল তাদেরই অন্তরে। তাই তারা মানতো একমাত্র অন্তরের নীতি। মানুষ আইনের দাস নয়, সে মানবে তার অন্তরকে। তার অন্তরে সমস্ত সত্য নিহিত। সে পুলিশের দারোগাও নয়, গোলামও নয় —সে মানুষ, আর সমস্ত আইন তার মধ্যে।

রান্নাঘরের দোর খুলে এক যুবক এসে ঢুকলো। এই ইয়াফিম। রাইবিন তাকে পরিচিত ক'রে দিলো পেভেলের সংগে, তারপর বই বাছা শুরু হ'ল। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ইয়াফিম বললো, মেলাই বই দেখছি আপনাদের, কিন্তু পড়বার ফুরসুৎ বোধ হয় কম, গ্রামে কিন্তু পড়ার সময় প্রচুর।

কিন্তু ইচ্ছে বোধ হয় কম।—পেভেল বললো।

কম? কম কেন হবে! যথেষ্ট ইচ্ছে তাদের। দিনকাল কেমন পড়েছে জানেন তো; ভাববার শক্তি হারিয়ে যে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়, তার মৃত্যু অবধারিত। মানুষ তো আর মরতে চায় না, তাই ভাবতে শুরু করেছে। তাইতো বই'র চাহিদা ভূতত্ত্ব—এটা কি?

পেভেল ভূতত্ত্ব কি বুঝিয়ে বলতে ইয়াফিম বললো, জমির উদ্ভব হ'ল কি ক'রে চাষারা তো তত জানতে চায় না, যত জানতে চায় জমি কি ক'রে তাদের বেহাত হ'য়ে জমিদারের হাতে গেলো। পৃথিবীটা স্থির থাকুক, ঘুরুক,

দড়িতে ঝুলুক, যা খুশি হ'ক—কোনো আপত্তি নেই তাদের—তারা শুধু চায় খাবার।

এমনি ভাবে বই বাছাই চলতে লাগলো। পেভেল ইয়াফিমকে জিগ্যেস করলো, তোমার নিজের জমি আছে ?

হাঁ, ছিল, কিন্তু জমি চ'ষে আর রুটি মেলে না, তাই ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি, এবার সৈন্যদলে ঢুকবো। কাকা বারণ করেন, বলেন, সৈন্যদের কাজতো লোকদের ধ'রে ঠ্যাঙানো। কিন্তু আমি যাবো, বহুযুগ ধ'রে মানুষদের সৈন্যের সাজে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, আজ তার অবসান করার দিন এসেছে। কি বলেন ?

দিন এসেছে সত্য, কিন্তু কাজটা শক্ত। সৈনিকদের কি বলতে হ'বে, কেমন ক'রে বলতে হবে, তা জানা চাই।

তা জানবো, শিখবো।

কর্তারা টের পেলে গুলি ক'রে মারবে।

তা জানি। জানি যে তারা কোনো দয়া দেখাবে না। কিন্তু লোক তো জাগবে। আর এই জাগরণই তো বিদ্রোহ। নয় কি ?

এবার ওঠা যাক।

রাইবিন, ইয়াফিম উঠে পড়লো। বইগুলো হাতে নিয়ে ইয়াফিম বললো, আজকাল এ-ই আমাদের আঁধারের আলো।

তারা চ'লে গেলে পেভেল এণ্ড্রিকে বললো, রাইবিনের তেজ আছে দেখছি।

এণ্ড্রি বললো, হাঁ আমিও তা' লক্ষ্য করেছি।·· চাষীদের মন আজ বিষিয়ে উঠেছে। ওরা যখন জাগবে, ওরা যখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে, সমস্ত জিনিষ ওরা ওলট-পালট ক'রে দেবে। ওরা চায় মুক্তি,

জমি—তাই সমস্ত-কিছু প্রতিষ্ঠানকে ওরা ভেঙে-চুরে পুড়িয়ে ভূমিসাৎ ক'রে দেবে মুষ্টি-মুষ্টি ভস্মের মধ্যে বিলুপ্ত হ'বে তাদের ওপর যুগ-যুগান্তর ধ'রে অনুষ্ঠিত অন্যায়।

পেভেল বললো, তারপর তারা লাগবে আমাদের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

না পেভেল। আমরা তাদের দলে টানতে পারব। বোঝাতে পারব যে, মজুর আর চাষী একই ব্যথার ব্যথী, একই পথের পথিক। আমি জানি, তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করবে, আমাদের দলে যোগ দেবে।

আঠারো

দিন কয়েক পরে নিকোলাই এসে হাজির হ'লো। বললো, ব্যাটাকে আমিই সাবাড় করবো মনে করেছিলুম, কিন্তু মাঝখান থেকে কে এসে মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলে।

পেভেল স্নেহ-ভরা কণ্ঠে বললো, চুপ, চুপ, যা তা বলো না।

নিকোলাই বললো, কি করব আমি। দুনিয়ায় কোথায় আমার স্থান —কিছুই বুঝি না। সব চোখে দেখি, মানুষের ওপর যে অন্যায় হচ্ছে, তা মর্মে মর্মে অনুভব করি; কিন্তু খুলে বলার ভাষা পাই না। বন্ধু, আমায় কাজ দাও একটা কঠিন কাজ দাও এই অন্ধ, অকেজো জীবন আর সহ্য করতে পাচ্ছিনা আমি তোমরা এক মহান কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছো, সে কাজ ক্রমশ এগোচ্ছে, দেখছি অথচ আমি দূরে দাঁড়িয়ে। কাঠ তুলি, তক্তা ফাড়ি···অসহ্য। আমায় একটা শক্ত কাজ দাও ভাই।

পেভেল বললো, দোবো।

এণ্ড্রি ব'লে উঠলো, চাষীদের জন্ত আমরা একখানা কাগজ বের কচ্ছি। তুমি টাইপ সাজানো শিখে কম্পোজিটারের কাজ কর। আমি তোমায় শিখিয়ে দোবো।

নিকোলাই বললো, তা যদি দাও, তাহ'লে এই ছুরিখানা তোমায় উপহার দোবো।

এণ্ড্রি হেসে উঠলো, ছুরি। ছুরি নিয়ে কি করব ?

কেন,—ভালো ছুরি, দেখো না !

আচ্ছা, সে দেখা যাবে , এখন চল, বেড়িয়ে আসি।

তিন জনে বেড়াতে বেরিয়ে গেলো।

দিন ব'য়ে চললো এমনি ক'রে। পয়লা মে'র উৎসবের আয়োজনও চলতে লাগলো পূর্ণ মাত্রায়। পথে ঘাটে, কারখানায়, দেয়ালে, থানার গায়ে, লাল ইস্তাহারের ছড়াছড়ি। পেভেল এণ্ড্রি দিন-রাত সমানে খাটে। মার ওপরও বহুৎ কাজের ভার থাকে। মা সারাদিন তাই নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ান। স্পাইতে পল্লি ভ'রে গেছে, কিন্তু কাউকে হাতে-কলমে ধরতে পাচ্ছেনা। পুলিশদের শক্তিহীনতা দেখে তরুণদের আশা এবং উৎসাহ বাড়ছে।

তারপর এলো সেই পয়লা মে।

মা সব্বার আগে জেগে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চাপালেন। জল ফুটে গেলো, কিন্তু তিনি ছেলেদের ডাকলেন না। আজ ওরা একটু ঘুমোক, এ ক'দিন এতো খেটেছে।

কারখানার পয়লা বাঁশি বেজে গেলো। তখনো তাদের ঘুম ভাঙলো না। দ্বিতীয় বাঁশি বাজতে এণ্ড্রি উঠে পেভেলকেও ডেকে তুললো। তারপর চা খেতে গেলো মায়ের কাছে।

মা এণ্ড্রিকে একান্তে বললেন, এণ্ড্রি ওর কাছে-কাছে থাকিস বাবা।

নিশ্চয়ই। যতক্ষণ সম্ভব, থাকবো।

পেভেল বললো, চুপি-চুপি কি কথা হ'চ্ছে তোমাদের ?

কিছু না। মা বলছিলেন, হাত মুখ বেশ ক'রে ধুতে, যাতে মেয়েরা আমাদের দিকে চেয়ে আর না চোখ ফেরাতে পারে। ব'লে এণ্ড্রি হাত মুখ ধুতে চ'লে গেলো।

পেভেল গাইতে লাগলো মৃদুস্বরে, ওঠো, জাগো, মজুরদল

মা বললেন, শোভা-যাত্রার বন্দোবস্ত করলে পারতিস এখন।

বন্দোবস্ত সবই ঠিক হ'য়ে আছে মা। যদি আমরা ধরা পড়ি, আইভানোভিচ এসে যা করার করবে। সে তোমায় সব রকমে সাহায্য করবে।

বেশ—মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন।

ফেদিয়া মেজিন যৌবনোচিত উৎসাহ এবং আনন্দ-দীপ্ত হ'য়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, শুরু হ'য়ে গেছে। সবাই রাস্তায় বেরিয়েছে, নিকোলাই, শুসেভ, শ্যাময়লোভ কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। বেশির ভাগ লোক কারখানা ছেড়ে বাড়ি চ'লে এসেছে। চলো, আমরাও যাই, এই ঠিক সময়। দশটা বেজে গেছে।

যাচ্ছি।

দেখবে, মধ্যাহ্ন-ভোজের পর সবাই জেগে উঠবে।

মেজিন, এণ্ড্রি, পেভেল, মা—চারজনেই বেরিয়ে পড়লেন পথে। দোরে, জানলায়, পথে, সর্বত্র লোকের ভিড় এবং কোলাহল। সবাই এণ্ড্রি, পেভেলের দিকে চাইছে, সবাই তাদের অভিনন্দিত করছে। এক জায়গায় একজন চিৎকার ক'রে উঠল, পুলিশ ধরবে ওদের, তা হ'লেই সব শেষ।

আর একজন জবাব দিলো ধরুক, তাতে কি হয়েছে!

আর একটু দূরে জানলা দিয়ে ভেসে আসছে এক রমণীর অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, একবার ভেবে দেখ, তুমি কি একা?—একা নও। ওরা সব অবিবাহিত। ওদের কি

যোশীমভের পা কলে কাটা পড়েছিল ব'লে কারখানা থেকে সে মাসোয়ারা পেতো। তার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে সে জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, পেভেল, পাজী, তোর মুণ্ডুটা ওরা ছিঁড়ে না নেয় তো কি বলেছি!

মা শিউরে উঠলেন, ক্রুদ্ধ হলেন। তারা কিন্তু কিছুমাত্র গায়ে না মেখে দিব্যি সাত-পাঁচ গল্প করতে করতে চললো। মিরোনোভ ব'লে এক মজুর এসে তাদের বাধা দিয়ে বললো, শুনছি নাকি তোমরা দাংগা করতে যাচ্ছ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জানলা ভাঙতে যাচ্ছো?

পেভেল বললো, সে কি! আমরা কি মাতাল?

এণ্ড্রি বললো, আমরা যাচ্ছি শুধু নিশান নিয়ে শোভা-যাত্রা বের করতে, আর মজুরদের গান গাইতে। সে গান তোমরাও শুনতে পাবে। সে তো শুধু গান নয় সে মজুরদের মন্ত্র, মজুরদের মতবাদ!

মিরোনোভ বললো, সে সব আমি জানি। আমি তোমাদের লেখা পড়ি কি না তারপর মা, তুমিও বুঝি বিদ্রোহ করতে চলেছো।

হাঁ। মৃত্যু যদি আসে, আমি সত্যের সংগে গলাগলি হ'য়ে পথ চলবো।

ওরা দেখছি নেহাৎ মিথ্যা বলেনি যে, তুমিই কারখানায় নিষিদ্ধ ইস্তাহার ছড়াও।

কারা বলেছে?—পেভেল জিগ্যেস করলো।

লোকেরা! আচ্ছা, আসি তা'হলে।

মিরোনোভ চ'লে যেতে পেভেল বললো, তুমিও দেখছি মা জেলে যাবে।

যাই যাবো—মা ধীরে ধীরে বললেন।

সূর্য ওপরে উঠলো। বেলা বাড়ছে। লোকের উত্তেজনাও বাড়ছে।

বড় রাস্তার গায়ে এক গলির মাথায় শ'খানেক লোকের ভিড়। তার মধ্য দিয়ে আসছে নিকোলাইর গলা মুগুরের ঘায়ের মতো ওরা আমাদের রক্ত নিঙরে নিচ্ছে, ফল থেকে রস যেমন ক'রে নেওয়া হয়।

সত্যি কথা—এক যোগে অনেকগুলি কণ্ঠ বেজে উঠলো।

এণ্ড্রি .বললো, সাবাস নিকোলাই। বলেই সে তার দেহটা কর্ক-স্ক্রুর মতো ভিড়ের মধ্যে গলিয়ে দিলো। পরক্ষণেই বেজে উঠলো তার গলা, বন্ধুগণ, ওরা বলে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন জাতি ইহুদী, 'জার্মান, ইংরেজ, তাতার কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। দু'টি মাত্র পরস্পর-বিদ্বেষী জাত আছে দুনিয়ায়—ধনী এবং দরিদ্র। ধনীদের পোষাক বিভিন্ন হ'তে পারে, ভাষা স্বতন্ত্র হ'তে পারে, দেশ হিসাবে তারা ফরাসী, জার্মান অথবা ইংরেজ হ'তে পারে, কিন্তু মজুরদের সংগে কারবারের বেলা তারা সবাই একজাত, সবাই তাতার। নিপাত যাক এই ধনীর দল ?

শ্রোতাদের মধ্যে একটা উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেলো।

এণ্ড্রি বলতে লাগলো, এবার চাও মজুরদের দিকে। ফরাসী মজুর, জার্মান মজুর, ইংরেজ মজুর—সবাই কাটাচ্ছে আমাদের রুশ-মজুরের মতোই কুকুরের

ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এণ্ড্রি গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, বিদেশের মজুররা আজ এই সোজা সত্য বুঝতে পেরেছে। আজ পয়লা মে'র এই উজ্জ্বল দিবসে তারা আবদ্ধ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ; কাজ ছেড়ে, রাস্তায় এসে দলে দলে মিলিত হ'য়ে তারা আজ পরস্পরকে দেখছে, আর হিসাব

নিচ্ছে তাদের বিপুল শক্তির। এইদিনে মজুরদের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে একটি প্রাণ,—মজুরদের যে কী বিপুল শক্তি, এই জ্ঞানে সকল প্রাণ আলোকিত; সমস্ত হৃদয়ে আজ বন্ধুত্বের স্পন্দন, সংগীদের সুখের জন্য, তাদের মুক্তি এবং সত্যলাভের জন্য যে যুদ্ধ, তাতে আত্মদান করতে সবাই আজ প্রস্তুত।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, পুলিশ।

উনিশ

চারজন অশ্বারোহী পুলিশ 'ভাগো' 'ভাগো' ব'লে ছুটে এলো। পলকে মজুররা ছত্রভংগ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো। এণ্ড্রি তখনও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ঘোড়া তার গায়ে এসে পড়ার উপক্রম দেখে সে স'রে দাঁড়ালো, আর তক্ষুণি মা তাকে টেনে নিলেন, তুমি না কথা দিয়েছো, পেভেলের সংগে সংগে থাকবে।

ঘাট্ হ'য়ে গেছে মা, তাই থাকবো।

আবার চলতে লাগলো তারা।

গির্জার বাগানে এসে থামলো। চার-পাঁচশো লোকের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, ছুটোছুটি করছে চারদিকে, প্রজাপতির মতো আনন্দে। জন-সমুদ্র দুলছে একবার এদিকে, একবার ওদিকে। ভিড়ের মধ্যে শিজভের গলা,—না আমাদের ছেলেদের আমরা ত্যাগ করবনা। জ্ঞানে ওরা আমাদের শ্রেষ্ঠ, সাহসে ওরা আমাদের শ্রেষ্ঠ। জলাভূমির জন্য অন্যায় কর হ'তে কারা

আমাদের রক্ষা করেছে ?—ওরা ! এ কথাটা ভুললে চলবে না। এ ক'রে ওরা জেলে গেছে, কিন্তু সুফল ভোগ করছি আমরা—আমরা সকলে।

বাঁশি বেজে উঠলো, জনতার কলরবকে ডুবিয়ে দিয়ে। সবাই চমকে উঠলো। যারা ব'সে ছিল, উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত—সব মৃত্যুর মতো নিরব, নিথর। সবারই সতর্ক-দৃষ্টি, মলিন-মুখ। তার মধ্যে আচম্‌কা ধ্বনিত হ'ল পেভেলের দৃঢ় কণ্ঠ, বন্ধুগণ।

মার চোখের সামনে জ্বলে উঠলো যেন আগুনের দীপ্তশিখা সমগ্র শক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি নিজের দেহটা পেভেলের পিছনে এনে দাঁড় করালেন। সকলের দৃষ্টি ফিরলো পেভেলের দিকে চুম্বক যেন টানছে লৌহ-শলাকাকে।

বন্ধুগণ। ভাইগণ। আজ লগ্ন উপস্থিত আজ বর্জন করতে হ'বে আমাদের এই জীবন, এই লোভ, ঈর্ষা, অন্ধকারের জীবন, এই হিংসা, মিথ্যা, অপবিত্র জীবন, এই জীবন—যেখানে আমাদের কোন স্থান নেই, যেখানে আমরা মানুষ ব'লে পরিগণিত নই।

পেভেল থামলো, জনতা নিঃশব্দে তার দিকে আরো চেপে দাঁড়ালো। মা ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন কী গর্বপূর্ণ সাহস-দীপ্ত জ্বলন্ত ছেলের চোখ।

বন্ধুগণ, আমরা সংকল্প করেছি, মুক্তকণ্ঠে প্রচার করব আমরা কে। আমরা আজ নিশান তুলে ধরব আকাশে যুক্তির নিশান, সত্যের নিশান, স্বাধীনতার নিশান। এই সেই নিশান।

জনতার মধ্য দিয়ে মজুরদের লাল ঝাণ্ডা লাল পাখির মতোই ঊর্ধ্বে উত্থিত হ'ল পেভেলের হাতে। তারপর হঠাৎ তা নুয়ে পড়তেই দশ বারোখানা হাত তা ধ'রে ফেললো—তার মধ্যে মাও ছিলেন। পেভেল জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো, মজুরের জয়!

শত শত কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি হ'ল।

সোশ্যাল-ডিমোক্রেটিক মজুর দলের জয়, সকল দেশের সকল মজুরের জয়!

জনতা যেন উত্তেজনায় টগ্ বগ্ ক'রে ফুটছে। নিশানের অর্থ যারা বোঝে, তারা ভিড় ঠেলে তার দিকে এগোয়। মা পেভেলের হাত চেপে ধ'রে আনন্দে আবেগে কাঁপতে থাকেন। নিকোলাইও পেভেলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

সকল কোলাহল ছাপিয়ে এণ্ড্রির কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল, বন্ধুগণ, আমরা আজ এক পবিত্র জয়-যাত্রার সূচনা করলুম নবীন এক দেবতার নামে। আমাদের সে দেবতা হচ্ছে—সত্য, আলোক, যুক্তি, মংগল। এই পবিত্র জয়-যাত্রার পথ যেমন দীর্ঘ, তেমনি কণ্টক-সংকুল। আমাদের লক্ষ্য দূরে, অতি দূরে। কাঁটার মুকুট আমাদের সামনে নাচচে, আমাদের অপেক্ষায়। যারা সত্যের শক্তিতে বিশ্বাসী নও, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সত্য রক্ষা করার সাহস যাদের নেই, আত্ম-শক্তিতে যারা বিশ্বাস কর না, দুঃখের নামে যারা শংকিত হও,—তারা তফাতে সরে দাঁড়াও। আমরা তাদেরই আহ্বান করছি, যারা বিশ্বাস করে, জয়ী আমরা হবোই। আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ, তারা আমাদের সংগ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাক তারা চিরদিন পাবে শুধু দুঃখ। সংগীদল সজ্জিত হ'য়ে দাঁড়াও, বলো, জয়যুক্ত হ'ক এই পয়লা মে জয়যুক্ত হ'ক মুক্ত মজুর-সংঘের এই উৎসব-তিথি।

হাজার হাজার কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো সংগে সংগে, জনতা চেপে দাঁড়ালো। পেভেল লাল নিশান তুলে ধরলো তাতে সূর্যের রক্ত-বর্ণ কিরণ এসে ঝক্-ঝক্ ক'রে জলতে লাগলো। ফেদিয়া মেজিন চেঁচিয়ে উঠলো, পুরোণো জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে পড় যাত্রীদল!

যাত্রা শুরু হ'ল। সব্বার আগে নিশান হাতে পেভেল। তারপরই অন্যান্য নায়কদল। সবাই মজুরদের বিজয়-সংগীত গাইতে গাইতে চলেছে :

ওঠো, জাগো, মজুরদল !

ক্ষুধিত মানব যুদ্ধে চল্।

পথের দু'ধার থেকে দলে দলে লোক সোল্লাসে নিশানের দিকে ছুটে আসে, ভিড়ে মিশে যায়, তারপর বিপ্লব-সংগীতে গগন আলোড়িত ক'রে অগ্রসর হয়।

মা এ গান এর আগেও শুনেছেন বহুবার। কিন্তু আজ যেন প্রথম এর সুর তাঁর প্রাণে গিয়ে লাগলো,—

দুঃখী সংগী কাঁদিছে হায় !

সেথা যেতে হবে আয়রে আয়

জনতা গানের সুরে মেতে উঠতে লাগলো।

এক মা যাত্রী ছেলেকে বেঁধে রাখার চেষ্টায় কেঁদে উঠছেন। মিতিয়া, কোথায় যাচ্ছিস, বাবা।

মা তাকে বললেন, ছি বোন, যেতে দাও, ভয় পেয়োনা, ভয় কি? আমিও প্রথম প্রথম ভয় পেতুম; কিন্তু এখন—ঐ দেখ, আমার ছেলে সবার আগে—নিশান হাতে—ঐ

শংকিতা মাতার কানে তা গেলো না। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন আর্তকণ্ঠে, ডাকাতরা করছে কি? কোথায় যাচ্ছে? সৈন্যরা যে ওদের মেরে ফেলবে গো !

মা বললেন, অধীর হয়োনা বোন। মহৎ কাজের ধরণই এই। যীশুখৃস্ট তিনিই কি যীশুখৃস্ট হ'তে পারতেন, যদি না শত সহস্র লোক তাঁর জন্য মরতো?

গানের সুর তখন আরও চ'ড়ে গেছে—

জারের যখন সৈন্য চাই

ছেলে দাও, ন'লে রক্ষা নাই

শিরভ জোর গলায় ব'লে উঠলো, সাবাস্‌ জোয়ান, ভয়ডর কিছু নেই তোমাদের। আমার ছেলে, সে যদি আজ বেঁচে থাকতো। কারখানা তাকে খুন করেছে। হাঁ, খুন করেছে।

মার বুকের রক্ত দ্রুততালে নেচে উঠলো। কিন্তু ভিড়ের অসম্ভব চাপে তিনি কোণ-ঠেসা হ'য়ে এক দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন জন-স্রোতের বিচিত্র গতি। হাজারে হাজারে উন্মত্ত লোক মনে হয় যেন একটা বৃহৎ কাঁসার জয়-ঢাকের প্রলয়ংকর ধ্বনি তাদের মাতিয়ে তুলেছে কেউ মাতছে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায়, কেউ মাতছে একটা অস্পষ্ট. আনন্দে, একটা নতুন-কিছুর সম্ভাবনায়, একটা জলন্ত কৌতূহলে। বহু বছরের পুঞ্জীভূত কণ্টকিত ব্যথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেন আজ সংগীতের মধ্য দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছে।

সবাই ঊর্ধ্বে, নিশানের দিকে চেয়ে পথ চলেছে, সবাই চিৎকার করছে, কিছু-না-কিছু বলছে, কিন্তু সমস্ত কণ্ঠ ডুবিয়ে বেজে উঠছে সেই গান নতুন গান এ সে পুরোণো দুঃখ করুণ সুর নয়, এ সে অভাব-ক্লিষ্ট ভয়াতুর ব্যক্তিত্বহীন নিরানন্দ নিঃসংগ নিশি-যাত্রীর আর্ত-বিলাপ নয়, এ সে রুদ্ধ-শক্তির অভিব্যক্তি বেদনা নয়। ভালোমন্দ দুই-ই অবিভেদে নাশ করে যে—এ সেই ক্রুদ্ধ সাহসের উত্তেজিত সুর নয়। এ সে পশুশক্তি নয়, যা সুদ্ধ মুক্তির জন্যই মুক্তি চাই ব'লে চিৎকার ক'রে, যা অন্যায়ের প্রতিহিংসা বশে শুধু ধ্বংসই করে চলে, সৃষ্টি করতে পারে না। দাসত্ব, দূষিত, পুরোণো জগতের কোনো-কিছু নেই এতে। সোজা সরল সুদৃঢ় শান্ত এ সংগীত। মানুষকে এ

মাতিয়ে নিয়ে চলে, দীর্ঘ অন্তহীন পথে সমুজ্জল ভবিষ্যতের অভিমুখে, পথের দুঃখ এ গোপন করে না। এর স্থির অচঞ্চল আগুনে জ্বলে পুড়ে গলে যায় মানুষের স্তূপীকৃত দুঃখ-বেদনা, তার চিরাভ্যস্ত মলিন সংস্কার ভার, নব-যুগের সম্বন্ধে তার মিথ্যা আশংকা।

সেই বিশাল জন-সমুদ্র এই সংগীতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এগিয়ে চললো, পেছনে সংশয়ী বিজ্ঞদল। এ অভিনয়ের কখন কোথায় অবসান হ'বে, তা যেন তারা আগে থেকেই জানে। মা শুনলেন তাদের কথা।

এক দল স্কুলের কাছে, আর একদল কারখানার কাছে।

গভর্ণর এসে পড়েছে।

তাই নাকি?

হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখলুম তাঁকে।

একজন তা শুনে সোল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠলো, আমাদের ওরা কম ডরায় মনে করেছো? এইতো দেখো—গভর্ণর স্বয়ং সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন।

মার বিজ্ঞদের কথা ভাল লাগছিল না—ভিড় ঠেলে তিনি সামনে এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ মনে হ'ল, জন-স্রোতের অগ্রভাগ যেন কি একটা কঠিন জিনিসের ওপর ঘা খেয়ে পেছনে টলে পড়ছে জনতার মধ্য দিয়ে উঠছে একটা মৃদু কিন্তু আতংক-ভরা গুঞ্জন। গানের সুরটাও একবার কেঁপে উঠলো। তারপর ধ্বনিত হ'ল আরো উচ্চ এবং দ্রুত তালে। কিন্তু আবার গানের তাল ভংগ হ'ল গায়কদল একে একে সরে পড়তে লাগলো দল থেকে—এদিকে ওদিকে দু'চারটি কণ্ঠ গানকে বাঁচিয়ে রাখার দুরূহ চেষ্টায় চেঁচাতে লাগলো,

"ওঠো, জাগো, মজুর দল।
ক্ষুধিত মানব যুদ্ধে চল!"

শোভা-যাত্রার সামনে কি ব্যাপার হচ্ছে তা চোখে দেখতে না পেলেও মা যেন ভাবতে পারলেন। দ্রুতপদে তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললেন।

ক্ষুড়ি

এগিয়ে পেভেলের গলা পেলেন।)

বন্ধুগণ, সৈনিকেরাও আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের মারবে না। কেন মারবে? সকলের হিতার্থে আমরা সত্য প্রচার কর্চ্ছি ব'লে? এ সত্য ঐ সৈনিকদেরও হিতকর। এখন ওরা একথা বুঝছে না বটে, কিন্তু সে দিন আসছে যখন ওরা আমাদের সংগে যোগ দেবে, যখন ওরা সমবেত হবে—ঐ ডাকাত এবং খুনীদের পতাকা—যাকে ঐ মিথ্যাবাদী পশুদল গৌরবে এবং সম্মানের পতাকা ব'লে অভিবাদন করতে ওদের বাধ্য করে—তার তলে নয়,—আমাদের এই মুক্তির এবং মংগলের পতাকা তলে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এ পতাকা নিয়ে, যাতে তারা সত্বর এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে। এগোও বন্ধুগণ, দৃঢ় পদে এগিয়ে চলো।

পেভেলের কণ্ঠ দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কিন্তু জনতা ছত্রভংগ হ'য়ে পড়ল। একে একে ডাইনে-বাঁয়ে বাড়ির দিকে, বেড়ার পাশে ভেগে যেতে লাগলো লোক। জনতার আকৃতি হ'য়ে পড়লো গোঁজের মতো, আর তার আগায় নিশান-হাতে পেভেল।

পথের শেষে বাগানের বাইরে যাবার পথ বন্ধ ক'রে বেয়োনেটধারী একদল সৈন্য—দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে।

মা আরো এগিয়ে গেলেন।

পেভেল বললো, সংগীগণ, সমস্ত জীবনভোর অগ্রসর হও। আর কোন গতি নেই আমাদের, গাও—

ওঠো, জাগো, মজুরদল!

ক্ষুধিত মানব যুদ্ধে চল—!

নিশানটা আরও ঊর্ধ্বে উঠে ঢেউ খেলে খেলে সৈন্য-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেলো। মা শিউরে চোখ বুজলেন। জনতা সভয়ে থমকে দাঁড়ালো। এগোলো শুধু পেভেল, এণ্ড্রি, শ্যামরলোভ ও মেজিন।

মেজিনের কণ্ঠে বেজে উঠলো সংগীতের সুর ভীষণ রণে

ভয়-চকিত মোটা গলা পেছন থেকে গেয়ে উঠলো, সঁপিয়ে প্রাণ—গানের দু'টো চরণ বেরিয়ে এলো দু'টো দীর্ঘনিশ্বাসের মতো। জনতা আবার পা বাড়ালো সামনের দিকে তাদের পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা গেলো। গান আবার নতুন, জোরের সংগে নতুন ভাবে বেজে উঠলো—

ভীষণ রণে সঁপিলে প্রাণ

পর তরে দিলে আত্মদান

কে যেন ঠাট্টার সুরে ব'লে উঠলো, আহা হা, ব্যাটারা গান ধরেছে দেখোনা, যেন শ্রাদ্ধ-সংগীত!

আর একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠ এলো, মারো ব্যাটাদের।

মা বুকে হাত চেপে ধরলেন, চেয়ে দেখলেন, সেই বিরাট জনতা চঞ্চল, সচকিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে চলেছে নিশান হাতে জন বারো লোক,—তারাও আবার এক এক ক'রে ছিটকে যাচ্ছে দল থেকে

পায়ের তলার মাটি যেন হঠাৎ তেতে আগুন হয়েছে, এমনি ভাবে। কেদিয়া গেয়ে উঠলো,

শেষ হবে এ অত্যাচার

মানুষ জাগিবে পুনর্বার

সমবেত সুর ধ্বনিত হ'ল—

হঠাৎ সুরভংগ হ'য়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ এলো, সংগীন চালাও।

মুহূর্তমধ্যে সঙীনগুলো উর্ধ্বে উত্থিত হ'য়ে সূর্যালোকে ঝলমল ক'রে উঠলো।

মার্চ।

ঐরে আসছ, ব'লে একজন খোঁড়া একলাফে রাস্তার একপাশে গিয়ে স'রে দাঁড়ালো।

মা নিষ্পলকে চেয়ে রইলেন। সৈন্যদল গোটা রাস্তাটায় ছড়িয়ে পড়ে সঙীন উঁচিয়ে মার্চ করে আসছে—শান্তভাবে। খানিক দূর এসে তারা স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মা ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন এণ্ড্রি পেভেলের আগে গিয়ে নিজের দীর্ঘ দেহ দিয়ে তাকে আগলে রেখেছে, আর পেভেল তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—সামনে থেকে স'রে দাঁড়াও। এণ্ড্রি মাথা উঁচু ক'রে মহোৎসাহে গাইছে, পেভেল তাকে ঠেলা দিয়ে আবার বলছে, পাশে যাও, নিশান সামনে থাক।

'ভাগো' ব'লে একজন সামরিক কর্মচারী সজোরে ভূমিতে পদাঘাত ক'রে চকচকে একখানা তলোয়ার খেলাতে লাগলো। তার পেছনে আরও একজন কর্মচারী।

মা যেন শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর বুক ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল। দু'হাতে বুক চেপে তিনি এগোতে লাগলেন—জ্ঞানশূন্য, চিন্তাশূন্য। পেছনে জনতা পাতলা হ'য়ে যাচ্ছে—শীতল বাতাহত পত্রের মতো তারা ঝ'রে পড়ছে দল থেকে।

লাল নিশানের চারদিকে মজুররা আরো ঘেঁসাঘেঁসি হ'য়ে দাঁড়ালো। সৈনিকেরা সঙীন দিয়ে তাদের তাড়া করতে লাগলো। মা শুনলেন, পেছনে পলাতকদের শংকিত পদশব্দ, আর কণ্ঠস্বর—

পালাও, পালাও—

দৌড়ে যাও, মা—

পিছিয়ে এসো, পেভেল।

নিশান ছাড়ো পেভেল, আমায় দাও, আমি লুকিয়ে রাখছি, ব'লে নিকোলাই নিশানটা ধরলো। বারেকের জন্ম নিশান পেছনে হেলে পড়লো। পেভেল বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলো, ছাড়ো নিশান।

নিকোলাই হাত টেনে নিলো যেন হাত তার আগুনে পুড়ে গেছে। গান থেমে গেলো। সংগীরা পেভেলকে ঘিরে দাঁড়ালো, পেভেল তাদের ঠেলে বেরিয়ে এলো সামনে। অকস্মাৎ সকল কোলাহল থেমে গিয়ে দেখা দিলো এক গভীর নিরবতা।

তারপরেই শোনা গেলো সামরিক কর্মচারীর হুকুম, নিশানটা ছিনিয়ে নাও, লেফটেনেণ্ট।

হুকুমপ্রাপ্ত লেফটেনেণ্ট একলাফে পেভেলের কাছে গিয়ে নিশানটা ধ'রে টানতে লাগলো, ছাড়ো, ছাড়ো।

নিশানটা দু'লে উঠলো, একবার ডাইনে হেললো, একবার বাঁয়ে। তারপর আবার সোজা হ'য়ে উঠতে লাগলো আকাশে।

লেফটেনেণ্ট পিছিয়ে ব'সে পড়লো, নিকোলাই ঘুষি বাগাতে বাগাতে তীরবেগে ছুটে গেলো মার পাশ ঘেঁসে।

ধরো ব্যাটাদের—সামরিক কর্মচারী গর্জন ক'রে উঠলো। তক্ষুণি অনেকগুলো সৈন্য সামনে ঝাপিয়ে পড়লো সঙীন উচিয়ে। নিশানটা

প্রবলভাবে দু'লে উঠে পড়ে গেলো নিচে, আর পলকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো সৈন্যদের মধ্যে।

একজন আর্তনাদ ক'রে উঠলো, উহু! মা ক্ষিপ্তা ব্যাঘ্রীর মতো চিৎকার ক'রে উঠলেন, পেভেল। সৈন্যদের মধ্য হ'তে স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব এলো পেভেলের, 'মা, বিদায়, বিদায়!'

তবে বেঁচে আছে সে! আমাকে মনে আছে—মার প্রাণে এই দু'টো ভাব স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো।

সংগে সংগে এলো এণ্ড্রির কণ্ঠ, মাগো চলনুম।

মা হাত তুলে নাড়ালেন, বুড়ো পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে পেভেল এণ্ড্রিকে দেখতে লাগলেন। এণ্ড্রিকে দেখা যাচ্ছিল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, এণ্ড্রি, পেভেল।

সৈন্যদলের মধ্য থেকে তারা ধ্বনি ক'রে উঠলো, বন্ধুগণ, বিদায়, বিদায়!

প্রতিধ্বনি হ'লো অজস্র কণ্ঠে—বাড়ির ছাদ থেকে, ঘরের জানলা থেকে, ছত্রভংগ জন-সমুদ্র থেকে।

লেফটেনেণ্ট মাকে ঠ্যালা দিয়ে চেঁচাতে লাগলো, ভাগো ভাগো!

মা চেয়ে দেখলেন, নিশানটা ভেঙে দু'-টুকরো হ'য়ে গেছে, একটা টুকরোতে লাল কাপড়টা জড়ানো। নুয়ে সেটা নিতেই কর্মচারী মার হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিলো এবং ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদর্পে গর্জন ক'রে উঠলো, যাও বলছি, এখান থেকে।

সৈন্যদের মধ্য থেকে গানের সুর ভেসে এলো, ওঠো, জাগো মজুরদল। চারদিকে সব-কিছু ঘুরছে, দুলছে, কাঁপছে। টেলিগ্রাফের তারের ঝংকারের মতো, একটা গাঢ় ভীতিপ্রদ ধ্বনি উত্থিত হ'চ্ছে। সামরিক কর্মচারিটি

সক্রোধে হুংকার ক'রে উঠলো। ব্যাটাদের গান বন্ধ কর, সার্জেন্ট ক্রেনড। মা টলতে টলতে গিয়ে সেই ছুঁড়ে-ফেলা নিশান-টুকরো আবার তুলে নিলেন।

মুখ বন্ধ কর ব্যাটাদের।

গানের সুর প্রথমটা এলোমেলো হ'ল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ হ'ল।

একজন সৈন্য মাকে পেছন থেকে টেনে মার মুখ ঘুরিয়ে ঠেলে দিলো, বাড়ি যা বুড়ি।

মার যেন পা চলে না। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে।

পালা না ডাইনী, ব'লে একজন তাকে এক ঠেলায় রাস্তার পাশে সরিয়ে দিলো। মা নিশানের লাঠিটায় ভর দিয়ে চলতে লাগলেন দ্রুত পদে। পা তার ভেঙে এলো। দেয়াল এবং বেড়া ধ'রে ধ'রে চ'লছেন। সৈন্তেরা খালি হাঁকছে—যা, যা বুড়ি।

মা চ'লে যাবেন ভাবলেন, কিন্তু অজ্ঞাতে তাঁর পা যেন তাঁকে আবার সামনের দিকে চালিয়ে নিলো। পথ শূন্য। মা দাঁড়ালেন। দূর হ'তে অস্পষ্ট শব্দ কানে এলো। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন তিনি। রাস্তার মোড়ে এক দল লোক। উত্তেজিত কণ্ঠে কোলাহল করছে।

ওরা শুধু বাহাদুরি দেখাবার জন্য সঙীনের সামনে বুক পেতে দিচ্ছেনা— এটা মনে রেখো।

দেখো দিখি ওদের দিকে চেয়ে, সৈন্তেরা এগোচ্ছে আর ওরা নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে।

একবার পেভেলের কথা ভাবো।

আর এণ্ড্রি, সেও কি কম?

ঐ কর্মচারী ব্যাটা'র রকম দেখ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন—ব্যাটা শয়তান।

মার মনের কথা যেন কণ্ঠ দিয়ে ঠেলে বেরোতে চাচ্ছিলো। ঠেলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, প্রিয় বন্ধুগণ ,

সবাই সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ করে দিলো।

একজন বললো, দেখ, দেখ, ওঁর হাতে নিশান। আর একজন কঠিন কণ্ঠে বললো, চুপ।

মা হাত ছড়িয়ে দিয়ে ব'লতে লাগলেন, বন্ধুদল, শোনো। মানুষ তোমরা, একবার প্রাণ খুলে দাঁড়াও। নির্ভয়ে, নিরাতংকে চোখ খুলে চাও। দেখো, আমাদের ছেলেরা আজ জয়-যাত্রায় বেরিয়েছে। আমাদের সন্তান আমাদের রক্ত আজ সত্যের রণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অন্তরে তাদের স্যায়ের দীপ্তি। তারা উন্মুক্ত করছে আজ এক নতুন পথ—সহজ এবং বৃহৎ—সকল মানুষের জন্য , তোমাদের সকলের জন্য, তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য এই পবিত্র ব্রতে আত্মোৎসর্গ করছে তারা। আবাহন করছে এই চির উজ্জ্বল নবযুগের সূর্যকে। তারা চায় নবজীবন, সত্য-স্যায়-মংগল-মণ্ডিত জীবন।

মার প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে, বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে, কণ্ঠ তপ্ত শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে। অন্তরের অন্তস্তলে উথলে উঠছে এক মহান বিশ্ব-প্লাবী প্রেমের বাণী। জিভ পুড়ে যাচ্ছে—এমনি প্রচণ্ড তার শক্তি; এমনি মুক্ত তার গতি। জনতা নির্বাক হ'য়ে কান পেতে তাঁর কথা শুনছে। এরাও যাতে পেভেলের মতো সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই ভেবেই যেন মা তাদের উত্তেজিত করতে লাগলেন, আমাদের ছেলেরা আজ করাঘাত করছে সুখ-নিকেতনের রুদ্ধ দ্বারে। তাদের অভিযান আমাদের সকলের জন্য। তাদের অভিযান আজ সকল-কিছুর বিরুদ্ধে, যা দিয়ে মিথ্যাচারী ঈর্ষাপর হিংসাব্রতী শত্রুদল আমাদের ধ'রে বেধে পিষে ফেলছে। হে আমার

বন্ধুগণ, তোমাদের—শুধু তোমাদেরই জন্য আজ তরুণের এ বিদ্রোহ। তারা যুদ্ধ করছে সমস্ত মানুষের, সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মজুরের পক্ষ হ'য়ে। তারা মুক্ত করছে এক সত্যোদ্ভাষিত শুভ্রপথ তোমাদেরই চলার জন্য। সেই তোমরা কি আজ তাদের ছেড়ে চ'লে যাবে? ত্যাগ করবে? বর্জন করবে? নির্জন কণ্টক-সংকুল পথে তাদের একা রেখে পালাবে?—না। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মুখ চাও, তাদের গভীর ভালবাসার কথা স্মরণ করো, নিজেদের দুর্গতির কথা ভাবো, ছেলেদের প্রাণ-শক্তিতে বিশ্বাস কর। ওরা যে সত্যের বর্তিকা জ্বেলেছে, তা ওদের অন্তরে জ্বলছে, ওরা তাতে পুড়ে মরছে। ওদের বিশ্বাস করো, বন্ধুগণ, ওদের সাহায্য কর

গভীর উত্তেজনায় রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে মা ঢ'লে পড়লেন। পিছন থেকে একজন তাঁকে ধরে ফেললো। সবাই যেন গরম হয়ে উঠেছে, বলছে, ঠিক কথা, সাঁচ্চা কথা · আমরা কেন ভয়ে পালাবো ছেলেদের ছেড়ে।

বুড়ো শিজভ বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে বললো, আমার ম্যাট্ভি কারখানায় মারা পড়েছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, আমি নিজে তাকে ওদের দলে ভিড়িয়ে দিতুম। আমি নিজে তাকে বলতুম, ম্যাট্ভি, তুমিও যাও ঐ সত্যের রণে, ন্যায়ের রণে। মা ঠিক কথা বলেছেন,—আমাদের ছেলেরা চেয়েছিল—জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তি এবং সম্মানের ওপর। আর সেই অপরাধে আমরা তাদের ত্যাগ ক'রে ভীরুর মতো পালিয়ে এসেছি।

জনতা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সবার দৃষ্টি মায়ের ওপর। মার দুঃখ যেন সবার অন্তরকে স্পর্শ করেছে, মার আগুন যেন সবার প্রাণ দীপ্ত ক'রে তুলেছে।

শিজভ মার হাতে সেই নিশান-টুকরো গুঁজে দিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে চললো। জনতাও পেছন পেছন গেলো। তারপর দু'জনে ঘরে ঢুকতে জনতা যে যার বাড়ি চ'লে গেলো। [প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

সমস্ত দিনটা মার চোখের সামনে নাচতে লাগলো সেই শোভাযাত্রার ছবি! অস্থির, উন্মনা হ'য়ে কখনো তিনি ভাবেন, কখনো বাইরের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পর পুলিশ এলো তৃতীয়বার বাড়িতে। মাকে বললো, ছেলেদের মনে রাজভক্তি, ধর্মভাব জাগাতে পারো না—এতো তোমাদের মায়েদেরই দোষ। তারপর ভালো ক'রে খানাতল্লাশী ক'রে চ'লে গেলো। ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে মা খানিকক্ষণ অন্ধকারে ব'সে রইলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন বিছানায়।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, সেই শোভা-যাত্রা নায়ক পেভেল, এণ্ড্রি গান চলেছে পেভেলের দিকে চেয়ে চলেছেন তিনি শহরের পথে পেভেলের কাছে যেতে লজ্জা হচ্ছে কারণ তাঁর পেটে একটা·· আর একটা ছেলে কোলে মাঠে আরো অনেক ছেলের মেলা, বল খেলছে তারা কোলের ছেলেটা তাদের দেখে জোরে কাঁদছে সৈন্যেরা ধেয়ে আসছে সঙীন উচিয়ে মা ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলেন মাঠের মাঝখানে উঁচু গির্জায় শ্রাদ্ধ-কৃত্য চলছে সেখানে, পুরুতরা গাইছে একজন পুরুত আলো নিয়ে এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, গ্রেপ্তার কর - দেখতে দেখতে পুরুত হ'য়ে গেলো সামরিক কর্মচারী সবাই ছুটে পালাচ্ছে মা পলাতকদের সামনে কোলের ছেলেটাকে তাদের সামনে ফেলে দিয়ে বলছেন, পালিয়োনা, ছেলেটার মুখ চাও· এণ্ড্রি ছেলেটাকে কাঠ-বোঝাই গাড়িতে চাপিয়ে দিলো নিকোলাই গাড়ির পাশে হেঁটে চলছে হেসে বলছে, এবার একটা শক্ত

কাজের ভার পেয়েছি। কাঁচা পথ জানালায় জানালায় নর-মুণ্ডের ভিড়। এণ্ড্রি বলছে, গাও মা জীবনের জয় গান · মা ঠাট্টা ভেবে রাগছেন···তারপর হঠাৎ পথের পাশের অতল গহ্বরে টলে পড়ে গেলেন· আতংক-ভরা চিৎকারে মা'র ঘুম ভাঙলো। মা উঠে পড়লেন, তারপর হাত-মুখ না ধুয়েই তিনি ঘর গোছাতে লেগে গেলেন। নিশানের টুকরো তুলে উনোনে দিতে গিয়ে, হঠাৎ কি ভেবে লাল কাপড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখলেন। জানালা ধুলেন, মেঝের ধুলেন, স্নান করলেন, চা চাপালেন তারপর যেন আর কোনো কাজ রইলো না তাঁর! কেবল মনে হ'তে লাগলো, এখন?—এখন কি করি?

হঠাৎ মনে পড়লো, প্রার্থনা করা তো হয়নি।

প্রার্থনায় বসলেন প্রার্থনা করলেন, কিন্তু প্রাণ তবু শূন্য। সময় আর কাটে না।

এমন সময় নিকোলাই, আইভানোভিচ এসে দেখা দিলো। মা ভয় পেয়ে ব'লে উঠলেন, এখানে এসেছ কেন? টের পেলেই ধরবে ওরা।

আইভানোভিচ মাকে আশ্বস্ত ক'রে বললো, এণ্ড্রি-পেভেলের সংগে কথা ছিল, তারা ধরা পড়লে তোমায় আমি শহরে নিয়ে যাবো। যাবে তো মা?

যাবো, ওরা যখন ব'লে গেছে—আর তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।

অসুবিধা কিছু হ'বে না মা। সংসারে লোক মাত্র আমরা দু'টি, আমি আর আমার আমার বোন শোফি। কিন্তু সেও থাকে না, মাঝে মাঝে আসে।·

মা বললেন, হাঁ. যাবো আমি, এখানে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে পারি না।

আইভানোভিচ বললো, কাজ তুমি আমাদের ওখানে পাবে মা।

আমি ঘরের কাজের কথা বলছিনা!

ঘরের কাজ নয়, যে কাজ তুমি চাও, তাই।

কি কাজ দেবে আমায়?

জেলে পেভেলের সংগে দেখা ক'রে সেই চাষী—যে কাগজ বের করার কথা বলেছিল, তার ঠিকানা যদি আনতে পারো!

মা সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, জানি, তার ঠিকানা আমি জানি। কাগজ দাও, আমি দিয়ে আসছি তাদের।···আমায় একাজে টেনে নাও· ·সর্বত্র আমি যাবো তোমাদের কাজে, শীত মানবোনা, গ্রীষ্ম মানবো না, মৃত্যু দেখেও পিউরে উঠবোনা সত্য-পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে এগিয়ে যাবো আমায় কাজ দাও।

চারদিন পরে আইভানোভিচ মাকে তার শহরের বাড়িতে নিয়ে গেলো।

দুই

মা যেন এক ছেলের বাড়ি থেকে আর এক ছেলের বাড়ি এসেছেন। কোনো সংকোচ, কোনো অসুবিধা নেই তাঁর। সংসারে কোনো-কিছু গোছানো ছিল না, মা তা পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে নিলেন।

চা খেতে খেতে আইভানোভিচ বললো, আমি যে বোর্ডে কাজ করি মা, তার কাজ হল, চাষীদের অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে রিপোর্ট দেওয়া—বাস, ঐ পর্যন্ত। তাদের দুঃখমোচন করার কোনো চেষ্টা আমরা করি না। আমরা দেখি, তাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের অকাল-মৃত্যু,—আমরা দেখি, তাদের ছেলেরা জন্মায় ক্ষীণপ্রাণ, মরে মাছির মতো তাদের দুঃখের কারণ কি, তাও আমরা জানি, আর তার জন্য বেতন পাই।

মা জিগ্যেস করলো, তুমি ছাত্র নও?

না, আমি বোর্ডের অধীনে একজন গ্রাম্য শিক্ষক। চাষীদের বই পড়তে দিতুম এই অপরাধে আমার জেল হ'ল—জেল থেকে বেরিয়ে এক বইয়ের দোকানে কাজ নিলুম এবং সেখানেও সতর্ক হ'য়ে চললুম না ব'লে আবার জেল তারপরে আর্চাঞ্জেলে নির্বাসন। সেখানে হ'ল গভর্ণরের সংগে সংঘর্ষ ফলে ঠেলে পাঠালো শ্বেত-সাগরের উপকূলে পাঁচবছর সেখানে কাটিয়ে এলুম

এমন ভীষণ দুঃখকেও মানুষ কেমন ক'রে এতো সহজ ভাবে নিতে পারে মা সেই কথা ভাবতে লাগলেন।

আইভানোভিচ বললো, শোফি আসছে আজ।

বিয়ে হয়েছে তার?

সে বিধবা। তার স্বামী সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। তারপর পালায় সেখান থেকে। পথে ঠাণ্ডায় সর্দি হ'য়ে মারা যায়—প্রায় দু'বছর আগে।

শোফি কি তোমার ছোট?

দু'বছরের বড়। তার কাছে আমি বহুগুণে ঋণী। ওঃ, সে যা পিয়ানো বাজায়, চমৎকার!

থাকে কোথায়?

সর্বত্র, যেখানে সাহসী লোকের দরকার সেইখানেই শোফি হাজির।

এ কাজে আছে?

নিশ্চয়।

দুপুরের দিকে শোফি এসে হাজির হ'ল। আসতে-না-আসতেই মার সংগে ভাব হ'য়ে গেলো তার, বললো, পেভেলের মুখে তোমার কথা শুনেছি মা।

পেভেল অন্যের কাছেও তার কথা বলতো শুনে মার মনটা খুশিতে ভ'রে উঠলো।

শোফি বললো, মার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?

মা বললেন, কষ্ট, হাঁ বৈ কি। আগে হ'লে কষ্ট হত—কিন্তু এখন জানি, সে একা নয়, আমিও একা নই।

শোফি তখন কাজের কথা পাড়লো, বললো, এখন সব চেয়ে দরকারী কথা হচ্ছে, ওদের যাতে জেলে না পচতে হয়। বিচার শীগ্‌গিরই হচ্ছে। তারপর যক্ষুণি তাদের নির্বাসনে পাঠানো হ'বে, আমরা পেভেলকে মুক্ত করার চেষ্টা করব। সাইবেরিয়ায় তার কিছু করার নেই, তাকে এখানে দরকার।

মা বললেন, মুক্ত যেন সে হ'ল, কিন্তু কেরারী হ'য়ে থাকবে কি ক'রে ?

শোফিয়া বললো, আর শত শত কেরারী যেমন ক'রে থাকে। এইতো এইমাত্র একজনকে বিদায় দিয়ে এলুম। দক্ষিণ অঞ্চলে কাজ করতো সে। পাঁচবছরের নির্বাসন দণ্ড ছিল রইল মাত্র সাড়ে তিন মাস তাইত আমার এই পোশাকের জাঁকজমক· নইলে সত্যিই কি আর আমি এতোটা বাবু!

পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই শোফি সাজ-পোশাক করেছিল ফ্যাশান-দুরস্ত, মুখে ছিল তার সিগারেট। এবার সে-সব ধরাচুড়া ছেড়ে সহজ সরল স্বাভাবিক মানুষ হ'য়ে পিয়ানো নিয়ে বসলো।

আইভানোভিচ মিথ্যা বলেনি। শোফি পিয়ানো বাজায় অপূর্ব। তার হাতে পিয়ানো যেন কথা কইতে লাগলো। নানা ভাব, নানা রস শ্রোতাদের মনের মধ্য দিয়ে ঢেউ খেলে গেলো। মা মুগ্ধ হ'য়ে শুনলেন সে সংগীত। তার সমস্ত অতীত যে বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রে উঠলো দুঃখ-করুণ ছন্দে ছন্দে। মার মুখ ফুটলো। ধীরে ধীরে তিনি বর্ণনা ক'রে গেলেন তাঁর দুর্বিষহ বন্দিনী জীবনের মর্মন্তুদ দুঃখকাহিনী। এতো তিনি শুধু তাঁর নিজের কথা বলছেন না—তাঁরই মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নরনারীর অকথিত কাহিনী ব্যক্ত হচ্ছে। সেই জীবনের পর এই জীবন জাগ্রত, জলন্ত জীবন যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, মানুষ কি ছিল, কি সে হয়েছে এবং কি সে হ'তে পারে।

মার কাহিনী শুনে শোফি ব'ললো, একদিন আমি মনে করেছিলুম, আমি অসুখী তখন আমি একটি ক্ষুদ্র শহরে নির্বাসিত হাতে কোনো কাজ নেই · নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাববার নেই—কাজেই দুঃখগুলিকে জড়ো ক'রে ওজন করতে ব'সে গেলুম তারপর বাবার সংগে বিচ্ছেদ হ'ল জিমনাসিয়াম থেকে আমি বিতাড়িত, লাঞ্ছিত হলুম, তারপর জেল, সহকর্মীর

বিশ্বাস-ঘাতকতা, স্বামীর নির্বাসন, আমার পুনরায় কারাদণ্ড এবং নির্বাসন, স্বামীর মৃত্যু এমনি বহু দুঃখ পেয়েছি আমি! কিন্তু এ সব এবং এর দশগুণ দুঃখ একত্র ক'রেও তোমার জীবনের একমাসের দুঃখের সমান হয় না মা! বছরের পর বছর প্রত্যেকটি দিন তুমি কি যাতনাই না সহ্য করেছো। এমন সহ্যশক্তি তোমরা কোথায় পাও মা?

মা বললেন, আমাদের সইতে সইতে অভ্যাস হ'য়ে যায়।

শোফি বললো, আমি ভেবেছিলুম, জীবনকে আমি পুরোপুরি চিনেছি। কিন্তু আজ দেখছি ভুল। বইয়ে যা পড়েছি, কল্পনায় যা আন্দাজ করে নিয়েছি,—তোমার মতো ভুক্তভোগীর কথা শুনে বুঝলুম, তার চাইতে ঢের ঢের বেশি ভীষণ বাস্তব জীবন।

এমনি আরো অনেক কথা হ'ল।

কাগজ সম্বন্ধে স্থির হ'ল, শোফি মার সংগে গ্রামে গিয়ে সেই চাষীর সংগে সব ঠিক ঠাক ক'রে আসবে। গ্রামটা সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে।

তিন

তিন দিন পরে মজুরানীর ছদ্মবেশে শোফি আর মা যখন বেরিয়ে পড়লেন গ্রামের উদ্দেশে, তখন তাদের চেনাই দায়। মনে হয় যেন তারা আজীবন এই বেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দু'পাশে গাছের সারি, মাঝখানে পথ। হাঁটতে হাঁটতে মা প্রশ্ন করলেন, হাঁটতে কষ্ট হবে না তো?

শোফি হেসে বললো, এ পথে কি আমি এই নতুন বেরিয়েছি ভাবছ মা? আমার সব অভ্যেস আছে।

তারপর মানুষ যেমন ক'রে ছেলেবেলায় খেলা-ধূলোর কথা বর্ণনা করে, তেমনি ক'রে ব'লে গেলো শোফি তার বিচিত্র বিপ্লব-কাহিনী। কখনো সে রয়েছে নাম ভাঁড়িয়ে, দলিল-পত্র করেছে জাল। কখনো গোয়েন্দাদের চোখে ধূলি দিতে আত্মগোপন করেছে রকম-বেরকমের ছদ্মবেশে। শহরে শহরে চালান করেছে শত শত নিষিদ্ধ পুস্তক। নির্বাসিত সংগীদের মুক্তির আয়োজন ক'রে দিয়েছে সংগে করে তাদের বিপদ-সীমার বাইরে রেখে এসেছে। তার বাড়িতে একটা ছাপাখানা ছিল পুলিশ খানাতল্লাশ করতে এলে এক মিনিটের মধ্যে ভেল বদলে চাকরের সাজে আগন্তুকদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে তারপর গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে, মাথায় রুমাল বেঁধে, হাতে একটা কেরাসিনের টিন নিয়ে কেরোসিন-ওয়ালীর বেশে শীতের কনকনে হাওয়ায় শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চ'লে গেলো। আর একবার সে এসেছে নতুন এক শহরে বন্ধুদের সংগে দেখা করতে তাদের বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে এমন সময় দেখতে পেলো তাদের ঘরে খানাতল্লাশ

করছে পুলিশ; সেখানে তখন নিরাপদ নয় এক সেকেণ্ড ইতস্তত না ক'রে নির্ভীকভাবে সে নিচের তলার একটা ঘরের ঘন্টা বাজিয়ে ব্যাগ হাতে অপরিচিত লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়লো—তারপর সরল ভাবে নিজের অবস্থার কথা ব্যক্ত ক'রে বললো, আমায় ইচ্ছে হ'লে আপনারা পুলিশের হাতে দিতে পারেন, কিন্তু আমি জানি, আপনারা তা দেবেন না। লোকগুলো অত্যন্ত ভয় পেলো। সমস্ত রাত ঘুমোলোনা। প্রত্যেক মিনিট আশংকা করে, এই বুঝি পুলিশ এসে দরজা ঠেলে কিন্তু তবু তাকে ধরতে দিতে মন উঠলোনা পরদিন এই নিয়ে হাসাহাসি। তারপর আর একবার সে রেলগাড়িতে চলেছে একজন গোয়েন্দার সংগে এক গাড়িতে, এক আসনে স্ত্রীর সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশ গোয়েন্দাটি তখন তারই খোঁজে বেরিয়েছিল তারই কাছে গোয়েন্দা গল্প জুড়ে দিলো, কেমন দক্ষতার সংগে সে শোফিকে খুঁজে বের করেছে শোফি নাকি ঐ গাড়িরই দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় আছে। গাড়ি থামে, আর প্রত্যেকবার সে খুঁজে দেখে এসে শোফিকে বলে, না তাকে দেখছি না, ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। ওদেরও তো মেহনৎ কম নয়, আমাদের মতো ওদেরও জীবন বিপদ-সংকুল।

মা তার কাহিনী শুনে প্রাণ খুলে হাসেন। শোফির দীর্ঘ উন্নত দেহ, গভীর কালো চোখ দিয়ে ফুটে বেরোয় একটা দীপ্তি, একটা সাহস, একটা অনাবিল আনন্দ। পাখির গান শুনতে শুনতে, পথের ফুল তুলতে তুলতে, নৈসর্গিক দৃশ্যের ওপর মুগ্ধ-দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে দু'জনে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললো। শোফির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তিখানির দিকে চেয়ে মা বললেন, তুমি এখনো তরুণ।

শোফি হাসতে হাসতে বললো আমার বয়স, মা, বত্রিশ বছর।

মা বললেন, হো'ক, কিন্তু তোমার চোখ, তোমার কণ্ঠ এতো সজীব যে তোমাকে তরুণী বলে মনে হয়। এতো বিপদ-সংকুল জীবন তোমার, অথচ প্রাণ তোমার হাসছে।

শোফি বললো, প্রাণ আমার হাসছে, চমৎকার বলেছো মা; কিন্তু কষ্ট! কই, না তো। আমি তো মনে করি এর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে মজার জীবন আর হ'তে পারে না।

মা বললেন, সব চেয়ে তোমাদের এই জীবনটা আমার ভালো লাগে। তোমরা জানো, মানুষের প্রাণে ঢুকতে হয় কোন্ পথ দিয়ে। নির্ভয়ে, নির্ভাবনায় মানব-প্রাণের সমস্ত-কিছু তোমাদের সামনে খুলে যায়। পৃথিবীতে অন্যায়কে তোমরা জয় করেছো, সম্পূর্ণভাবে জয় করেছো।

শোফি জোর দিয়ে বললো, হাঁ, মা, আমরা জয়ী হব; কারণ আমরা মজুরদের সংগে এক হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। তাদের কাছ থেকেই আমরা পাই আমাদের কর্মশক্তি—সত্য যে জয়যুক্ত হবে এই স্থির বিশ্বাস। তারাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত দৈহিক এবং অলৌকিক শক্তির অফুরন্ত উৎস। তাদেরই মধ্যে নিহিত আছে সকল সম্ভাবনা, তাদেরই নিয়ে হ'চ্ছে সকল-কিছু সম্ভব। শুধু উদ্বুদ্ধ করা চাই তাদের শক্তি, তাদের জ্ঞান, তাদের আশা, তাদের বর্ধিত হবার, বিকশিত হবার স্বাধীনতা।

মা বললেন, কিন্তু এর জন্য কি পুরস্কার পাবে তোমরা?

শোফি সগর্বে জবাব দিলো, পুরস্কার তো আমরা পেয়েই গেছি, মা। আমরা এমন এক জীবনের আস্বাদ পেয়েছি যা আমাদের তৃপ্ত করেছে—প্রসারিত, পরিপূর্ণ আত্মার শক্তিতে সমুজ্জ্বল আমাদের জীবন দুনিয়ায় আর কি চাই আমাদের?

তিনদিনের দিন তারা সেই গাঁয়ে এসে পৌঁছালো। মাঠে একজন চাষী

কাজ করছিল। তার কাছ থেকে রাইবিনের ঠিকানা জেনে নিয়ে তারা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

রাইবিন, ইয়াফিম্ এবং আরো দুজন চাষী টেবিলে বসে খাচ্ছে এমন সময় মা গিয়ে ডাক দিলেন, ভালো আছো রাইবিন।

রাইবিন ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে মার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলো। মা বললেন, আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি রাইবিন। ভাবলুম, পথে ভাইকে একবার দেখে যাই, এ আমার বন্ধু, আনা।

রাইবিন শোফিকে অভিবাদন ক'রে মাকে বললেন, কেমন আছো? মিছে কথা বলোনা এ শহর নয় সব আমাদেরই লোক এখানে মিছে বলার দরকার নেই।

সবাই আগন্তুকদের দিকে চেয়ে আছে।

রাইবিন বললো, আমরা সন্ন্যাসীর মতো আছি এখানে কেউ আমাদের কাছ দিয়ে ঘেসে না কর্তাও বাড়ি নেই কর্ত্রী গেছেন হাসপাতালে·· আমি হলুম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট · বস নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত তোমরা ইয়াফিম, দুধ নিয়ে এসো ভাই।

ইয়াফিম ধীরে ধীরে উঠে গেলো দুধ আনতে। আর দু'জন সংগীর পরিচয় দিলো রাইবিন এই ইয়াকব, এই ইগ্নাতি।

তারপর জিগ্যেস করলে, পেভেল কেমন আছে?

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সে জেলে।

জেলে! আবার! জেল বুঝি তারি ভালো লেগেছে তার!

ইয়াফিম মাকে বসালো। রাইবিন শোফিকে বললো, ব'সো।

শোফি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলো রাইবিনকে।

রাইবিন মাকে জিগ্যেস করলো, কবে নিয়ে গেলো পেভেলকে ? ..তোমার দেখছি কপাল মন্দ। কি হ'য়েছিল ?

মা সংক্ষেপে পয়লা মের ব্যাপার বর্ণনা ক'রে গেলেন। শুনে ইয়াকিম বললো, গাঁয়ে ও রকম শোভা-যাত্রা করলে চাষীদের ওরা জবাই করবে।

ইয়াতি বললো, তা ঠিক। কারখানাই ভালো, আমি শহরে যাবো।

রাইবিন জিগ্যেস করলো, পেভেলের বিচার হবে ?

হাঁ।

কি শাস্তি হ'তে পারে ? শুনেছো কিছু ?

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসন।—মা শান্ত কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন। তিনজন চাষী একসংগে বিস্মিত হ'য়ে মার দিকে চাইলো। রাইবিন মুখ নিচু ক'রে ফের জিগ্যেস করলো, কাজে যখন নেবেছিল, তখন সে একথা জানতো ?

মা বললেন, জানি না, জানতো বোধ হয়।

শোফিয়া হঠাৎ জোর গলায় ব'লে উঠলো, 'বোধ হয়' নয়, ভালো ক'রেই জানতো।

সবাই নিরব, নিশ্চল, যেন জমাট বেধে গেছে শীতে।

রাইবিন ধীরে ধীরে বললো, আমারও তাই মনে হয়, সে জানতো। খাঁটি লোক, না ভেবে কোন কাজে নাবেনা ! সে জানতো, তার সম্মুখে সঙীন, তার সম্মুখে নির্বাসন।—জেনে শুনে সে গেলো। যাওয়া দরকার—তাই সে গেলো। যদি মা তার পথ রোধ করে শুয়ে থাকতেন, সে ডিঙিয়ে চলে যেতো। নয় কি মা ?

হাঁ।

রাইবিন তার সংগীদের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বললো, এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ নেতা।

আবার খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে রইলো। তারপর ইয়াকব হঠাৎ বলে উঠলো, ইয়াফিমের সংগে গিয়ে সৈন্ত-বিভাগে যোগ দিলে আমাদের লেলিয়ে দেওয়া হবে এই পেভেলের মতো মানুষের ওপর।

রাইবিন গম্ভীর মুখে বললো, তবে আর কাদের ওপর লেলিয়ে দেবে মনে কর? আমাদেরই হাত দিয়ে ওরা আমাদের কণ্ঠরোধ করে। এইখানেইতো ওদের যাদু।

ইয়াফিম জেদের সুরে বললো, কিন্তু আমি সৈন্তদলে যোগ দোবোই।

ইয়াতি বলে উঠলো, কে বারণ করছে তোমায়? যাও মরোগে—

তারপর হেসে বললো, গুলি যখন করবে আমাদের, মাথা লক্ষ্য ক'রে কোরো, যেন এক গুলিতেই সাবাড় হই, আহত হ'য়ে মিছি-মিছি না ভুগি।

রাইবিন সংগীদের লক্ষ্য ক'রে বললো, এই মাকে দেখ ছেলেকে ওঁর কোলে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তাতে কি দমেছেন?—না, দমেন নি। ছেলের স্থান পূর্ণ করেছেন এসে তিনি নিজে।

তারপর সজোরে টেবিল চাপড়ে বললো, ওরা জানে না অন্ধের মতো কিসের বীজ বুনে চলেছে ওরা। কিন্তু জানবে সেদিন জানবে, যেদিন আমাদের শক্তি হ'বে পরিপূর্ণ যেদিন এই বীজ পরিণত হ'বে ফসলে—আর আমরা কাটব সেই অভিশপ্ত ফসল।

রাইবিনের রক্ত-চক্ষু থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, দুর্দমনীয় ক্রোধে মুখ তয়ে উঠেছে লাল। একটু থেমে আবার সে বলতে লাগলো, সেদিন এক সরকারী কর্মচারী আমাকে ডেকে বলে, এই পাজী, পুরুতকে তুই কি বলেছিস্?

জবাব দিলুম, আমি পাজী হলুম কি ক'রে? কারো কোনো ক্ষতিও করি না, আর খাইও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, খেটে। বলতেই হুংকার দিয়ে উঠে লাগালো মুখে এক ঘুষি। তিন-দিন তিন-রাত রাখলো হাজতে পু'রে।

অদৃশ্য সরকারী কর্মচারীর উদ্দেশে তর্জন ক'রে রাইবিন বললো, এমনি করে' তোমরা লোকের সংগে কথা কও—না? শয়তানের দল, মনে ভেবেছো, ক্ষমা করব? না, ক্ষমা নেই। অন্যায়ের প্রতিশোধ নোবই নোব। আমি না পারি, আর কেউ নেবে। তোমাদের না পাই, তোমাদের ছেলেদের ধরব। মনে রেখো এ কথা। লোভের লৌহ-নখর দিয়ে মানুষকে তোমরা রক্তাক্ত করেছো, তোমরা হিংসার বীজ বপন করেছো, তোমাদের ক্ষমা নেই

রাগ যেন রাইবিনের মনে গর্জাতে লাগলো। শেষটা সুর একটু নরম ক'রে সে বললো, আর, পুরুতকে আমি কি বা বলেছিলুম? গ্রাম্য-পঞ্চায়তের পর চাষীদের নিয়ে তিনি বোঝাচ্ছেন, মানুষ হচ্ছে মেষপাল, আর তাদের সব সময়ের জন্যই চাই একজন মেষ-পালক। তা শুনে আমি ঠাট্টা করে বললুম, হাঁ, সেই যেমন এক বনে শেয়ালকে ক'রে দেওয়া হল পক্ষী-পালক। দু'দিন বাদে দেখা গেলো, রাশি রাশি পালকই পড়ে আছে বনে, পক্ষী আর নেই। পুরুত আমার দিকে একবার আড়নয়নে চেয়ে বলে যেতে লাগলেন, চাই ধৈর্য, ঈশ্বরের কাছে কেবল প্রার্থনা করো, প্রভু, আমায় ধৈর্য দাও। আমি বললুম, প্রভুটির যে ফুরসুৎ নেই শোনার, নইলে ডাকতে কি আমরা কসুর করছি। পুরুত তখন অগ্নিশর্মা হ'য়ে বললেন, তুই ব্যাটা আবার কী প্রার্থনা ক'রে থাকিস্? আমি বললুম, করি ঠাকুর, একটা প্রার্থনা আমি করি—যা শুধু আমি কেন, মানুষ মাত্রেই ক'রে থাকে। সেটা হচ্ছে, এই, হে ভগবান, দুনিয়ার এই কর্তাগুলোকে দিয়ে একবার ইটের বোঝা বওয়াও, পাথর ভাঙাও, কাঠ কাড়াও পুরুত আমার কথাটাও শেষ করতে দিলে না।...

তারপর আচমকা শোফির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, আপনি কি ভদ্র মহিলা ?

শোফি এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমাকে ভদ্রমহিলা ব'লে মনে করার কারণ ?

রাইবিন হেসে বললো, কারণ ? কারণ, ছদ্মবেশও আপনাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। ভিজে টেবিলে হাত পড়তেই আপনি শিউরে হাত টেনে নিলেন বিরক্তিভরে, তাছাড়া আমাদের মেয়েদের মেরুদণ্ড অতো সোজা হয়না।

রাইবিন পাছে শোফিকে অপমান করে ফেলে এই ভয়ে মা বললেন, ইনি আমাদের দলের নামজাদা কর্মী। এই কাজে ইনি মাথার চুল পাকিয়েছেন। তোমার ওসব বলা উচিত নয়।

রাইবিন বললো, কেন ? আমি কি অপমানকর কিছু বলেছি, বলে শোফির দিকে চাইলো।

শোফি হেসে বললো, না, কিছু বলতে চাও আমায় ?

আমি বলব না কিছু। ইয়াকবের এক ভাই কি যেন বলবে। তাকে ডাকব ?

ডাকো।

রাইবিন তখন ইয়াকিমকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, তুমি যাও, বোলো, সন্ধ্যার সময় যেন আসে।

তারপর মা ও শোফি পোঁটলা খুলে মেলা বই এবং কাগজ বের ক'রে দিলেন রাইবিনকে। রাইবিন বই কাগজ পেয়ে খুশি হল, শোফির দিকে চেয়ে বললো, কতোদিন ধরে একাজে আছেন আপনি ?

বারো বছর।

জেগে গেছেন ?

হাঁ।

অপরাধ নেবেন না এ সব প্রশ্নে। ভদ্রলোক আর আমরা যেন আলকাতরা আর জল, মিশিনা সহজে।

শোফি হেসে বললো, আমি ভদ্র নই—আমি শুধু মানুষ।

রাইবিন, ইয়াতি, ইয়াকব বই-কাগজ নিয়ে আনন্দে ঘরের ভেতর চলে গেলো। তারপর পড়তে শুরু করলো অসীম আগ্রহে। শোফি দেখলে, সত্য জানার জন্ত এদের কী বিপুল আগ্রহ—আনন্দদীপ্ত মুখে সে এসে দেখতে লাগলো, তাদের পাঠ।

ইয়াকব কি একটা প'ড়ে মুখ না তুলেই বললো, কিন্তু এসব কথায় আমাদের অপমান হয়।

রাইবিন বললো, না ইয়াকব, হিতাকাঙ্ক্ষীরা যাই বলুক, তাতে অপমান হতে পারে না।

ইয়াতি বললো, কি লিখছে শোনো, 'চাষীরা আর মানুষ নেই,' থাকবে কি ক'রে ? তোমরা এসে দু'দিন থাকো আমাদের ভেল নিয়ে—দেখবে, তোমরাও আমাদের মতো হয়ে গেছো।

এমনিভাবে চললো পড়া।

মা ঘুমিয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ বাদে পড়া শেষ করে চাষীরাও চলে গেলো কাজে।

চার

সন্ধ্যার সময় রাইবিনরা কাজ থেকে ফিরে এসে চা খেতে বসলো। হঠাৎ ইয়াফিম বলে উঠলো, ঐ কাশির শব্দ শুনছ ?

রাইবিন কান পেতে শুনে শোফিকে বললো, হাঁ, ঐ সে আসছে সেভলি আসছে। পারলে আমি ওকে শহরের পর শহরে নিয়ে যেতুম, পাবলিক স্কোয়ারে দাঁড় করিয়ে দিতুম, লোকে ওর কথা শুনতো। ও একই কথা বলে সব সময়, কিন্তু সে কথা সকলেরই শোনার যোগ্য।

ঘরের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে লাঠি ভর ক'রে বেরিয়ে এলো আনত, শীর্ণ, কংকাল .তাব নিশ্বাসেব শব্দ কানে এসে বাজছে। গায়ে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা কোট্, শুকনো খাড়া কটা চুল, মুখ আদ্দেক হা-করা, চোখ কোটরাগত ধক ধক করে জলছে রাইবিন শোফির সংগে তার পরিচয় করে দিতেই বললো, আপনিই চাষীদের জন্য বই এনেছেন ?

হাঁ।

চাষীদের পক্ষ হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওরা এখনো এই বই, যাতে সত্য প্রচার করা হয়েছে, তার মর্ম বোঝেনা। এখনো ওদের চিন্তা-শক্তির স্ফূরণ হয়নি, কিন্তু আমি সব নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি এবং সেই জন্যই ওদের হ'য়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এতো কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে এলো, কাঠির মতো আঙুল-গুলি দিয়ে চেপে অতি কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলো শুকনো মুখের মধ্য দিয়ে। শোফি বললো, সন্ধ্যাবেলার এতো ঠাণ্ডায় বেরোনো ভাল হয়নি আপনার।

ভালো! আমার পক্ষে ভালো একমাত্র মরণ। আমি মরতে চলেছি। মরব, কিন্তু যাবার আগে লোকের একটা উপকার করে যাবো, সাক্ষ্য দিয়ে যাবো—কত পাপ, কত অনাচার আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আটাশ বছর বয়স আমার কিন্তু এখনই আমি মরতে চলেছি। দশ বছর আগে অনায়াসে পাঁচশো পাউণ্ড কাঁধে তুলে নিতে পারতুম এ শক্তি নিয়ে সত্তর বছর বাঁচার কথা, কিন্তু দশ বছরের মধ্যে আমি শেষ হ'য়ে গেলুম। কর্তারা ডাকাত তারা আমার জীবন থেকে চল্লিশটা বছর ছিনিয়ে নিয়েছে, চল্লিশটা বছর চুরি করেছে।

রাইবিন সোফির দিকে চেয়ে বললো, শুনলেন তো—এই হচ্ছে ওর সুর।

সেভলি বললো, শুধু আমার নয়, হাজার হাজার লোকের সুর এই। কিন্তু তারা আওড়ায় এটা তাদের নিজেদের মনে মনে। বোঝেনা, তাদের এই মন্দভাগ্য জীবন দেখে মানুষ কতবড় একটা শিক্ষা পেতে পারে। কত লোক মরণের কোলে হেলে পড়ছে শ্রমের নিপীড়নে; কত লোক পংগু বিকলাংগ হ'য়ে ক্ষুধায় ধুঁকতে ধুঁকতে নিরবে প্রাণ দিচ্ছে। বজ্রকণ্ঠে আজ সেই কথা প্রচার করা দরকার, ভাইসব, বজ্রকণ্ঠে সেই কথা প্রচার করা দরকার।

উত্তেজনায় সেভ্লি কাঁপতে লাগলো।

ইয়াকিম বললো, তা কেন? মানুষ আমি—সুখ যতটুকু পাই, তার কথাই জানুক, দুঃখ আমার মনে মনেই থাক, কারণ সে আমার একান্ত নিজস্ব জিনিস।

রাইবিন বললো, কিন্তু সেভলির দুঃখ শুধু ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ইয়াকিম লক্ষ লক্ষ মানুষ আমরা যে দুঃখ ভুগছি, ও তারই একটা জলন্ত উদাহরণ। ওর মাঝে আমরা নিজেদের ভাগ্যই প্রতিফলিত দেখতে পাই।

ও একদম তলা পর্যন্ত নেবেছে· ভুগেছে তারপর দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলছে,:হুসিয়ার, এদিক পানে পা বাড়িয়ো না।

ইয়াকব সেভলিকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে বসালো। বসে সেভ্‌লি আবার বলতে আরম্ভ করলো, কাজের চাপে মানুষকে পিষে মারে ওরা। ধ্বংস করে মানুষের প্রাণ। কেন? কিসের জন্য? আজ জবাব চাই তার। মুনিবের কাপড়ের কলে আমার জীবন দিলুম আমি—আর তিনি? তিনি করলেন কি?—এক প্রণয়িনীকে সোনার হাত-ধোয়ার পাত্র উপহার দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রণয়িনীর প্রত্যেকটি প্রসাধন দ্রব্য হ'ল সোনার। সেই পাত্রের মধ্যে আমার বুকের রক্ত, সেই পাত্রের মধ্যে আমার সমগ্র জীবন। ওরই জন্য জীবন গেছে আমার! একটা লোক আমায় খাটিয়ে খুন করলো। কেন? না,-আমার রক্ত ছাড়া তার প্রণয়িনীর সুখ-সুবিধা হয় না, তার প্রণয়িনীর জন্য সোনার পাত্র কেনা হয় না।

ইয়াকিম মৃদু হেসে বললো, ঈশ্বরের মূর্তি ধরে নাকি মানুষ তৈরি হয়েছে—সেই ঈশ্বরের মূর্তির এই অবস্থা। চমৎকার বলতে হ'বে।

রাইবিন টেবিল চাপড়ে বললো, আর আমরা চুপ ক'রে থাকবো না। ইয়াকব যোগ করলে, সহ্য করবো না।

মা শোফির দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে শোফিকে জিগ্যেস করলেন, যা বলছে, তা সত্যি?

হাঁ। খবরের কাগজে এরকম উপহারের কথা বেরোয়। আর ও যেটা বললো, ও ব্যাপারটা মস্কোর।

রাইবিন প্রশ্ন করলো, কিন্তু সেই মুনিবের—ফাঁসি হ'ল না তার? কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। তাকে ঘর থেকে টেনে বের ক'রে জনসাধারণের সামনে হাজির ক'রে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে, তার অপবিত্র নোঙরা মাংস-পিণ্ড

কুকুরের মুখে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। একবার মানুষ জাগুক, তখন তারা এক বিরাট বধমঞ্চ প্রস্তুত করবে, আর সেখানে ওদের অজস্র রক্তধারায় ধৌত করবে এতদিনের অন্যায়। ওদের রক্ত ওদের নয় ও আমাদের আমাদের রক্ত আমাদের শিরা থেকে শোষণ ক'রে নিয়েছে ওরা·

সেভলি ব'লে উঠলো, শীত করছে।

ইয়াকব তাকে ধরে আগুনের কাছে বসিয়ে দিলো। রাইবিন সেভলিকে দেখিয়ে অনুচ্চস্বরে শোফিকে বলতে লাগলো, বইএর চেয়ে ঢের বেশী মর্মস্পর্শী এই জীবন-গ্রন্থ। মজুরের হাত যখন কাটা পড়ে—দোষ মজুরের নিজের। কিন্তু এমনি ভাবে একটা লোকের রক্তমোক্ষণ ক'রে তার শবটাকে যখন ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তখন ?—তখন কি বুঝতে হ'বে ? হত্যার অর্থ বুঝি, কিন্তু এই নির্যাতন, এর মানে বুঝতে পারি না। আমাদের ওপর ওদের এ নির্যাতন ওরা কেন করে জানো ?—করে দুনিয়ার আমোদ উৎসব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব আত্মসাৎ করবে বলে—করে যাতে মানুষের রক্ত দিয়ে ওরা সব-কিছু কিনতে পারে—সুন্দরী গণিকা, বার্মিজ টাটু, চাঁদির ছুরি, সোনার থালা, ছেলেমেয়ের খেলনা। তোরা কাজ কর, কাজ কর, আরো কাজ কর, কেবল কাজ কর, আর আমরা ? আমরা তোমাদের মেহনতের কড়ি জমাই, আমার প্রণয়িনীকে সোনার পাত্র কিনে দিই !

সেভলি বললো, আমি চাই তোমরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এই রিক্ত-সর্বস্ব জনগণের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও।

রাইবিন বললো, রোজ ও আমাদের এই কথা শোনাবে।

মা ব'লে উঠলেন, আর কি শুনতে চাও তোমরা ? হাজার হাজার মানুষ যেখানে দিনের পর দিন কাজ ক'রে মরছে, আর মুনিব তাদের মেহনতের কড়ি দিয়ে মজা লুটছে, সেখানে আর কি শুনতে চাও তোমরা ?

শোফি তখন দেশ-বিদেশের মজুর-প্রগতির কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে গেলো ; তারপর বললো, দিন আসছে, যেদিন সারা দুনিয়ার মজুররা মাথা তুলে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করবে, এ জীবন আর চাই না আমরা ! এ জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি হোক। সেদিন লুব্ধ ধনীর কাল্পনিক শক্তি লুটিয়ে পড়বে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে, তাদের অবলম্বন অন্তর্হিত হ'বে।

রাইবিন বললো, আর তার জন্ম চাই একটা জিনিস—নিজেদের হীন মনে করোনা, তাহলেই তোমরা সমস্ত-কিছু জয় করতে পারবে।

মা উঠে দাঁড়ালেন, এবার তা হলে আমরা যাই।

শোফি বললো, হাঁ চলো।

চাষীরা তাদের বিদায় দিলো—পরম আত্মীয়কে মানুষ যেমন ভাবে বিদায় দেয়।

পথে আসতে মা বললেন, এ যেন একটা সুন্দর স্বপ্ন। মানুষ আজ সত্য জানবার জন্ম উন্মুখ। উৎসবের দিন প্রত্যূষে দেখেছি, মন্দির জনহীন, অন্ধকার ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে, আলো জাগে, নরনারী সম্মিলিত হয়। এও তেমনি আমাদের প্রত্যূষ।

পাঁচ

এমনি বিচিত্র গতিতে ব'য়ে চললো মা'র জীবন স্রোত। শোফিও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে দেশময়—দু'দিন থাকে, তারপর কোথাও উধাও হ'য়ে যায়। কেউ টের পায় না, তারপর আবার অকস্মাৎ এসে হাজির হয়। আইভানোভিচ রোজ ভোর আটটায় চা খেয়ে মাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, তারপর ন'টায় আফিসে চলে যায়। মা ঘরের কাজ করেন, বই পড়তে শেখেন। আর ছবির বইয়ের দিকে মনসংযোগ করেন—ছবি দেখতে ভারি ভালো লাগে তাঁর—সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত-কিছু জিনিস তার চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর চলে তাঁর প্রধান কাজ—নিষিদ্ধ পুস্তক এবং ইস্তাহার ছড়ানো। নানা ছদ্মবেশে নানা স্থানে নানারকম লোকের সংগে তিনি চলেন, ফেরেন, গল্প করেন, মনের কথা কৌশলে বার করেন। গোয়েন্দারা তাকে কোনোদিনও ধরতে পারেনা। এমনিভাবে ঘোরার ফলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তাঁর কাছে আরো জীবন্ত হ'য়ে উঠলো। দুনিয়ায় অফুরন্ত ধন, আর তার মাঝে মানুষ দরিদ্র···রাশি রাশি অন্ন, আর তার মাঝে মানুষ উপবাসী···শত সহস্র জ্ঞানভাণ্ডার, আর তার মাঝে মানুষ নিরক্ষর শিক্ষাহীন···মানুষ পথের ধুলোয় বসে হাঁকে, একটি কড়ি ভিক দাও বাবা, আর তারই সামনে স্বর্ণশির্ষ, স্বর্ণগর্ভ দেব-মন্দির। এই দেখে দেখে যে মা এতো প্রার্থনাপরায়ণা ছিলেন, তাঁরও যেন ধীরে ধীরে প্রার্থনায় আগ্রহ ক'মে এলো।

পেভেলের বিচারের তারিখ এখনো স্থির হয়নি। পেভেলের কথা ভেবে মা আর তত আকুল হন না—পেভেলের সংগে সংগে আর সকল শহীদের

কথাও তার মনে জাগে—দুঃখের পরিবর্তে জাগে এক অনাস্বাদিত পূর্ব গৌরব আর আরব্ধ ব্রতে নিষ্ঠা।

শশেংকা মাঝে মাঝে দেখা করতে এসে পেভেলের কথা সুধোয়, ব'লে, সে কেমন আছে? আমার কথা জানিয়ো তাকে?—তারপর চলে যায়। শশেংকা পেভেলকে ভালোবাসে, মা জানেন। তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

অবসর পেলেই মা বই নিয়ে বসেন।

আইভানোভিচ মার চোখের সামনে এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরে বলে, মানুষ আজ অর্থের কাঙালী, কিন্তু একদিন যখন অর্থের চিন্তা আর তার থাকবেনা—শ্রম-দাসত্ব থাকবে না, তখন সে চাইবে সোনার চাইতেও বড় সম্পদ—জ্ঞান।

মা মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কবে—কতকাল পরে সে শুভদিন আসবে?

ছয়

আইভানোভিচ রোজ সময় মত অফিস থেকে ফেরে। সেদিন সে অনেকটা দেরি করে ফিরলো,—আর ফিরলো এক গরম খবর নিয়ে,—কোন একজন মজুর-কয়েদী জেল পালিয়েছে—কে তা জানা যায়নি এখনো।

মার প্রাণ যেন আশায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, কিন্তু কণ্ঠকে জোর ক'রে সংযত ক'রে বললেন, হয়তো পেভেল।

আইভানোভিচ বললো, খুব সম্ভব। আমি রাস্তায় বেড়াচ্ছিলুম দেখতে পাই কি না—বোকামি আর কাকে বলে। যাক্, আবার বেরুচ্ছি।

মা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমিও যাচ্ছি।

হাঁ, তুমি ইয়েগরের কাছে গিয়ে দেখো, সে কিছু জানে কি না।

মা বেশ জোর পায় ইয়েগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দুয়োরের দিকে চেয়ে চোখ তার বিস্ফারিত হল —নিকোলাই না? ঐ তো গেটের কাছে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কিন্তু না, কেউ তো নেই। তবে কি চোখের ধাঁধা। কিন্তু আবার নিচে চেয়েই মা চিৎকার করে উঠলেন, নিকোলাই, নিকোলাই,— তারপরই ছুটলেন তার দিকে। নিকোলাই হাত নেড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, যাও, যাও,—

মা যেমন নেবেছিলেন, তেমনি উঠে গিয়ে ইয়েগরের ঘরে ঢুকে ফিস্‌ফাস ক'রে বললেন, জেল পালিয়েছে নিকোলাই।

ইয়েগর হেসে বললো, তোফা। কিন্তু উঠে সম্বর্ধনা করবো এমন শক্তি তো আমার নেই।

বলতে বলতে পলাতক নিজেই ঘরে এসে ঢুকে দোর বন্ধ করে হাসিমুখে দাঁড়ালো। ইয়েগর বললো, বস ভাই।

নিকোলাই নিঃশব্দে হাসিমুখে মার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বললো, ভাগ্যিস তোমায় দেখলুম মা, নইলে জেলেই আবার ফিরতুম। শহরের কাউকে আমি চিনি না, তাই খালি ভাবছিলুম, কেন পালালুম? এমন সময় তোমার সংগে দেখা।

কেমন ক'রে পালালে?

সোফার একপাশে বসে ইয়েগরের হাতে হাত দিয়ে নিকোলাই তার পলায়নকাহিনী ব্যক্ত করে গেলো। ওভারসিয়াবদের ধরে কয়েদীরা ঠ্যাঙাতে শুরু করে—পাগলা-ঘণ্টা বেজে ওঠে—গেট খুলে যায়···এই ফাঁকে সে পালায়—তারপর ছন্নছাড়া হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় একটা লুকোবার স্থান আবিষ্কার করার জন্য

পেভেল কেমন আছে?

ভালোই আছে। আমাদের একজন মাতব্বর সে—কর্তাদের সংগে বাদানুবাদ করে—আর সবাই তাকে মানে।—কি খাবো? ভয়ানক ক্ষুধা পেয়েছে।

ইয়েগর বললো, সেলফের ওপর রুটি আছে, ওকে দাও। তারপর বাঁ পাশের ঘরটায় গিয়ে লিউদ্‌মিলাকে ডেকে বলো, খাবার নিয়ে আসুক।

মা গিয়ে ডাকতে লিউদ্‌মিলা বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো, কি? অবস্থা খারাপ নাকি?

না, খাবার চাইছে।

চলো—খাবার সময় হয়নি এখনো।

দু'জনে ইয়েগরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়েগর বললো, লিউদ্‌মিলা ভ্যাসিলিয়েভা, ইনি কর্তাদের হুকুম না নিয়ে জেল থেকে চলে এসেছেন,—পয়লা একে কিছু খেতে দাও, তারপর একে দিন-দু'দিন লুকিয়ে রাখো।

লিউদ্‌মিলা মাথা নেড়ে রোগীর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে বললো, তা রাখছি কিন্তু মুখটা থামাও দেখি, ইয়েগর। জানো, এ তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। ওরা আসামাত্র আমায় খবর দেওয়া উচিত ছিল। আর দেখছি ওষুদও খাওনি—এসব গাফেলি করার মানে কি? ওষুদ এক ডোজ খেলে একটু আরাম বোধ কর, এতো তুমি নিজেই বলো—তোমরা আমার ঘরে এসো—এ হাসপাতালে যাবে।

ইয়েগর বললো, হাসপাতালে না পাঠিয়ে ছাড়বে না তাহ'লে।

আমিও যাবো তোমার সংগে।

অর্থাৎ হাসপাতালে গিয়েও তোমার হাত থেকে নিস্তার নেই।

ব'কনা বলছি।

তারপর ইয়েগরের বুকে কম্বলটা টেনে দিয়ে শিশিতে ওষুদ কতটা আছে দেখে মার দিকে ফিরে বললো, আমি চললুম একে নিয়ে। তুমি ইয়েগরকে ওষুদ দিয়ো। আর কথা বলতে দিয়ো না।

তারা চলে যেতেই ইয়েগর বললো, চমৎকার মহিলাটি। ওর সংগে যদি কাজ করতে মা। ওই আমাদের কাগজ-পত্র সব ছাপিয়ে দেয়।

চুপ, ওষুদ খাও।

ইয়েগর ঢক ঢক ক'রে ওষুদ গিলে বললো, মরব ঠিকই মা, কথা না বললেও। আর তার জন্য, কুচপরোয়া নেই বাঁচার আনন্দের সংগে মরার বাধ্য-বাধকতা থাকবেই।

কথা কয়োনা।

কথা কবো না? বলো কি মা। চুপ ক'রে থেকে লাভ? মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বেশি বেঁচে থাকবো, বেশি দুঃখ সইবো। আর হারাবো সুলোকের সংগে কথা কইবার আনন্দ। পরলোকে কি আর এমন কথা কবার লোক খুঁজে পাবো মা।

চুপ কর, ঐ মহিলাটি এসে এর জন্য আমায় বকবেন।

মা, ও আমাদের দলেরই একটি কর্মী, বকবে ও তোমায় নিশ্চয়ই। কারণ বকা ওর অভ্যাস।

লিউদ্‌মিলা এসে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে বললো, নিকোলাইর পোশাক বদলে এক্ষুণি এস্থান ত্যাগ করা দরকার। এক্ষুণি গিয়ে পোশাক নিয়ে এসো।

মা কাজ পেয়ে খুশি হ'য়ে পথে বেরোলেন। তারপর ধারে-কাছে স্পাই আছে কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে গাড়ি ক'রে বাজারে গেলেন। পলাতকের পোশাক বদ্‌লি করার জন্য কেউ কাপড় কিনতে আসে কিনা, তা লক্ষ্য করার জন্য স্পাই ঘুরছিল বাজারে। মা তাদের চোখে ধুলি দিয়ে পোশাক কিনলেন, আর কেবল বগর-বগর করতে লাগলেন এমন লোক নিয়েও পড়েছি, খালি মদ, খালি মদ· আর মাস গেলেই এক-এক সুট পোশাক। পুলিশ ভাবলো, ওর মাতাল স্বামীর জন্য পোশাক কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

পোশাক এনে নিকোলাইর ভেল বদলে তাকে নিয়ে আবার রাস্তায় বেরুলেন। তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে চললেন।

পথে খবর পেলেন ইয়েগরকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে; অবস্থা

সংকটাপন্ন। তাঁর যাওয়া দরকার। মা তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনলেন, ইয়েগর ডাক্তারকে বলছে, আরোগ্য হচ্ছে এক রকম সংস্কার! নয় কি ডাক্তার?

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, বাজে বোকো না।

ইয়েগর বললো, কিন্তু আমি বিপ্লবী আমি সংস্কারকে ঘৃণা করি।

মা দেখলেন, ডাক্তারও তাদেরই একজন সহকর্মী। তার সংগে আলাপ হ'ল।

ইয়েগরকে আধা-শোয়া অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এবার সে বলে উঠলো, ও, বিজ্ঞান আর পারিনা—একটু শুই ডাক্তার?

না।

ডাক্তার মাকে বললো, দিয়োনা যেন শুতে। শুলে ওর ক্ষতি হ'বে।

ডাক্তার চলে যেতে ইয়েগর ধীরে ধীরে চোখ না খুলে বলে যেতে লাগলো, মরণ যেন আমার দিকে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে—অনিচ্ছার সংগে—আমার জন্য যেন ওর দরদ জাগছে—'আহা, এমন সুন্দর অমায়িক লোক তুমি—'

চুপ করো, ইয়েগর।

একটু সবুর কর মা, শীগগিরই চুপ করবো, চিরদিনের মতো চুপ করবো।

তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবু—ধীরে ধীরে, একটু একটু করে বলতে লাগলো, সে,—তোমার সংগ চমৎকার লাগছে মা—তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার ভাবভংগী অতি সুন্দর—কিন্তু এর পরিণাম?—অন্তরকে প্রশ্ন করি।—ভাবতে দুঃখ লাগে—কারাগার, নির্বাসন, নিষ্ঠুর অত্যাচার অন্যান্য সবাইর মতো তোমারও অপেক্ষা করছে। মা তুমি কারাগারকে ভয় কর?

না।

কর না? কিন্তু কারাগার সত্যিই নরক। এই কারাগারই আমায় মরণ-আঘাত দিয়েছে মা।—সত্যি কথা বলতে কি, আমি মরতে চাই না মা—আমি মরতে চাই না।

মা সান্ত্বনা দিতে গেলেন, এখনই মরার কি হয়েছে, কিন্তু ইয়েগরের মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো যেন জমে গেলো মুখে।

ইয়েগর বলতে লাগলো, অসুখ না হলে আজও কাজ করতে পারতুম। কাজ যার নেই—জীবন তার লক্ষ্যহীন বিড়ম্বনা।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ছেয়ে এলো। মা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে দুয়ার বন্ধ করার মৃদু শব্দে জেগে উঠে বললেন কোমলকণ্ঠে, ঐ যা, ঘুমিয়ে পড়েছিনুম। মাপ করো।

ইয়েগরও তেমনি কোমল কণ্ঠে জবাব দিলো, তুমিও মাপ কোরো।

হঠাৎ তীব্র আলো ফুটে উঠলো ঘরে—লিউদ্‌মিলা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরে, বলছে, ব্যাপার কি?

মার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে জবাব দিলো, ইয়েগর, চুপ।

মুখ হা করে খুলে মাথা উঁচু করলো সে। মা তার মাথাটা ধরে মুখের দিকে চাইলেন। সে মাথাটা সজোরে ছিটকে নিয়ে বলে উঠলো, বাতাস—বাতাস। তার শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ভেঙে পড়লো কাঁধের ওপর। উন্মুক্ত চোখের মধ্য প্রতিফলিত হল দীপের শুভ্র শিখা। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ইয়েগর, বাপ আমার!

লিউদ্‌মিলা জানলার কাছে গিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে বললো, আর কাকে ডাকছো মা!

মা নুয়ে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সাত

তারপর ইয়েগরকে বালিশের ওপর শুইয়ে দিয়ে, তার হাত দু'খানা ভেঙে বুকের ওপর রেখে মা লিউদ্‌মিলার কাছে এসে তার ঘন চুলে হাত বুলোতে লাগলেন। লিউদ্‌মিলা কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো,—অনেকদিন ধরে জানতুম ওকে। একসংগে নির্বাসনে ছিলুম,—একসংগে হেঁটেছি—একসংগে কারাবাস করেছি। মাঝে মাঝে বিপদ এসেছে, দুঃখ এসেছে, বহু লোক হতাশ হয়ে পড়েছে কিন্তু ইয়েগরের আনন্দের কমতি ছিলনা। কখনো হাসি-কৌতুকের প্রলেপ দিয়ে সে বেদনাকে ঢাকতো—দুর্বলকে বল দিতো। সাইবেরিয়ায় অলস জীবন যেখানে মানুষকে করে তোলে নিজের ওপর বিতৃষ্ণ, সেখানেও সে ছিল দুঃখ-জয়ী। যদি জানতে কতবড় সংগী ছিল সে। নির্যাতন অনেক সয়েছে, কিন্তু কেউ কখনো অভিযোগ করতে শোনেনি তাকে। আমি তার কাছে বহুঋণে ঋণী—তার মনের কাছে ঋণী তার অন্তরের কাছে ঋণী। বন্ধু সংগী প্রিয় আমার! বিদায় বিদায় তোমার চিহ্নিত পথে চলবো আমি সন্দেহে না টলে সমস্ত জীবন বিদায় বন্ধু, বিদায়! লিউদ্‌মিলা মৃতের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিলো।

পরদিন অন্ত্যেষ্টির আয়োজন হ'ল। আইভানোভিচ, শোফি, মা চায়ের টেবিলে বসে গম্ভীরভাবে ইয়েগরের কথা আলোচনা করছেন। হঠাৎ আবির্ভূত হল শশেংকা অন্ধকারের বুকে একটা দীপ্ত মশালের মতো। আনন্দ-উজ্জ্বল তার মূর্তি।

ইয়েগরের মৃত্যুর কথা সে জানেনা। এই দিনে তার আনন্দকে অত্যা

মনে ক'রে সবাই বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললো, আমরা ইয়েগরের কথা বলছিলাম।

শশেংকা বললো, ইয়েগর? চমৎকার লোক। নয়? বিনয়ী—নিঃসন্দিগ্ধ দুঃখজয়ী—চির-কৌতুকোচ্ছল রসিক—সুকর্মী—বিপ্লবচিত্র অংকনে সিদ্ধহস্ত, বিদ্রোহ-দর্শন রচনায় সুদক্ষ। কী সোজা সরল ভাষায় মিথ্যা এবং অত্যাচারকে সে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলে—ভীষণের সংগে কৌতুক মিশিয়ে কী অপূর্ব কৌশলে বাস্তবকে করে তোলে আরো ভীষণ, আরো হৃদয়গ্রাহী। আমি তার কাছে ঋণী—তার হাসিমুখ, তার কৌতুক, বিশেষ ক'রে সন্দেহক্ষণে তার সেই আশ্বাসবাণী—তা আমি কখনো ভুলবোনা—আমি তাকে ভালবাসি।

শোফি বললো, সেই ইয়েগর আজ মৃত।

মৃত! শশেংকা চমকে উঠলো। তারপর বললো, ইয়েগর মৃত একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত।

আইভোনোভিচ মৃদুহাস্যে বললো, কিন্তু এ সত্য কথা, সে মরেছে।

শশেংকা ঘরের এদিক-ওদিক পাইচারি করে হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক সুরে বলে উঠলো, মরেছে অর্থ কি? কি মরেছে? ইয়েগরের ওপর আমার ভক্তি? তার প্রতি আমার প্রেম? আমার বন্ধুত্ব? তার প্রতিভা? তার বীরত্ব? তার কর্ম? মরেছে এই সব? মরেনি, মরতে পারে না। তার যত-কিছু ভালো, আমি জানি, তা আমার কাছে কখনো মরবেনা। একটা মানুষকে 'মরেছে' বলে বিদায় করে দিতে আমাদের একটুও দেরি হয় না—তাই আমরা এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাই যে মানুষ কখনো মরেনা, যদি না আমারা ইচ্ছে করে বিস্মৃত হই, তার মনুষ্যত্বের গৌরব, সত্য এবং সুখকল্পে তার আত্মত্যাগী চেষ্টা। ভুলে যাই,

জীবন্ত যাদের প্রাণ তাদের মধ্যে সকল জিনিস সর্বকালে চিরজীবী হয়ে থাকে। চিরজীবী চির-ভাস্বর আত্মাকে তার দেহের সংগে সংগে এতো তাড়াতাড়ি মাটি-চাপা দিয়োনা, বন্ধু।...

কথাপ্রসংগে পেভেলের কথা উঠলো। শশা বললো, সে সংগীদের চিন্তাতেই সদা-বিব্রত। বলে কি জানো? সংগীদের জেল-পালানোর বন্দোবস্ত করা দরকার এবং তা নাকি খুবই সোজা।

শোফি বললো, তুমি কি মনে কর শশা? সত্যি সম্ভব এ?

মা চায়ের কাপ টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে কেঁপে উঠলেন। শশার মুখ বিবর্ণ, ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। তারপর হেসে বললেন, পেভেল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ—আর সে যা বলে তা যদি ঠিক হয়, তবে চেষ্টা করা আমাদের উচিত, আমাদের কর্তব্য।

শ্রোতাদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। শশা বেশ একটু আহত হয়ে বললো, তোমরা ভাবছ, আমার এতে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আছে?

শোফি বললো, সে কি শশা?

পাংশুমুখে শশা বললো, হাঁ, তোমরা যদি এর বিবেচনা করার ভার নাও, তাহ'লে আমি কোনো কথা কইবো না।

আইভানোভিচ বললো, পালানো সম্ভব হ'লে সে সম্বন্ধে দু'মত থাকতে পারে না; কিন্তু সবার আগে আমাদের জানা চাই, বন্দী বন্ধুরা এ চান কিনা।

মা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন, তারা কি মুক্তি চাইবেনা, এও কি সম্ভব?

আইভানোভিচ বললো, পরশু পেভেলের সংগে দেখা ক'রে একটা চিঠি দিয়ো তাদের মত আমরা জানি আগে

মা বললেন, তা পারবো।

শশা উঠে চলে গেলো ধীর মন্থর পদে শুষ্ক চোখে।

মা কান্নার স্বরে বলে উঠলেন, একটিবার, একটি দিনের জন্ম যদি ওদের দু'হাত এক করতে পারতুম!

আট

পরদিন ভোরে হাসপাতালের সামনে লোকে লোকারণ্য, মৃত বীরের শবদেহ শোভা-যাত্রা করে নিয়ে যেতে এসেছে সবাই। জনতা নিরস্ত্র, আর তাদের মধ্যে শান্তি-রক্ষা করতে এসেছে পুলিশ রিভলভার, বন্দুক, সঙীন নিয়ে।

গেট খুলে গেলো···তারপর বেরিয়ে এলো শবাধার·· ফুলের মালায় সাজানো···লাল-ফিতা দিয়ে বাঁধা। সবাই নিরবে টুপি খুলে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো, এমন সময় এক লম্বাপানা পুলিশ অফিসার একদল সৈন্য নিয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে শবাধারটি ঘিরে ফেলে হুকুম দিলেন, ফিতে সরিয়ে ফেল।

মৃতের প্রতি এই অসম্মানের সূচনায় জনতা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। পুলিশ অফিসারটি তা গ্রাহ্য না ক'রে স্বর চড়িয়ে হুকুম দিলেন, ইয়াকোলেভ, ফিতে কেটে ফেলো।

হুকুমমাত্র ইয়াকোলেভ তরবারি কোষমুক্ত ক'রে ফিতে কেটে ফেললো। জনতা নেকড়েদলের মতো গর্জন ক'রে উঠলো ; পুলিশের সংগে মারামারি বাধে আর কি। নায়করা কোনো মতে থামিয়ে রাখলো। লোকেদের

বললো, বন্ধুগণ, এখন আমাদের সব সরে যেতে হবে—যে-পর্যন্ত-না আমাদের দিন আসে।

শোভা-যাত্রা গোরস্থানে প্রবেশ করলো। সবাই নিরব, নিঃশব্দ। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভংগ করলো একটি যুবক, সদ্য-প্রস্তুত কবরের ওপর দাঁড়িয়ে সে শুরু করলো, সংগিগণ।

পুলিশ অফিসারটি উচ্চৈস্বরে বললেন, পুলিশ সাহেবের হুকুম, বক্তৃতা করা নিষেধ।

যুবকটি বললো, আমি মাত্র দু-চারটি কথা বলবো। সংগিগণ, আমাদের এই শিক্ষক এবং বন্ধুর কবরের ওপর দাঁড়িয়ে এস আজ আমরা নিরবে এই শপথ করি যে, আমরা এঁর অভিলাষ ভুলবো না, প্রত্যেকে অবিশ্রান্তভাবে খনন করতে থাকবো এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের কবর, যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের দুষমন।

পুলিশ অফিসার হুকুম দিলেন, গ্রেপ্তার কর ওকে।

কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেলো জনতার উন্মত্ত চিৎকারে, 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র নিপাত যাক্।' 'দীর্ঘজীবী হ'ক স্বাধীনতা' 'আমরা তার জন্ম বাঁচব, তার জন্ম প্রাণ দেব।'

তৎক্ষণাৎ পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো অস্ত্র হাতে নিরস্ত্র জনতার ওপর। মাও সেখানে ছিলেন। দেখলেন, মার খেয়েও জনতা সেই বক্তা যুবকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেন ছিনিয়ে নেবে পুলিশের হাত থেকে। পুলিশ তাকে ঘিরে রয়েছে—জনতার ওপর সঙীন চলছে, তলোয়ার চলছে, রক্তে গোরস্থান লাল হ'য়ে উঠছে যুবক তখন মিনতি করে বললো, ভাইসব, শান্ত হও, আমি বলছি, আমায় যেতে দাও।

তার কথায় জন-সমুদ্র স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর এক-এক ক'রে

রাইবিন মোটা গলায় বলে উঠলো, চাষীবন্ধুগণ, আমি চোর নই; আমি চুরি করি না, আমি কারও ঘরদোরে আগুন লাগাইনা। আমি শুধু যুদ্ধ করি মিথ্যার বিরুদ্ধে। তাই ওরা আমাকে ধরেছে। তোমরা কি শোনোনি সে-সব বইয়ের কথা, যার মধ্যে আমাদের চাষীদের সম্বন্ধে সত্য কথা বলা হয়েছে? আমি তাই ছড়িয়েছি চাষীদের মধ্যে; তারই জন্ম আমার এ শাস্তি।

জনতা রাইবিনের দিকে চেপে দাঁড়ালো। রাইবিন উচ্চকণ্ঠে বললো, চাষীবন্ধুগণ, এই বইগুলোতে বিশ্বাস কোরো। এর জন্ম আমার হয়তো আজ প্রাণ দিতে হবে। কর্তারা আমাকে মেরেছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে, কোত্থেকে আমি এ বইগুলি পাই তা জানার জন্ম—আরো মারবে। কেন জানো? এই বইয়ের মধ্যে সত্য কথা লেখা হয়েছে। খাঁটি পৃথিবী আর সাচ্চা বাত—তার কদর রুটির চাইতে বেশি—এই হচ্ছে আমার কথা।

চাষীরা কথাগুলো শুনছে, কিন্তু তাদের মনে কেমন যেন একটা ভয়, কেমন যেন একটা সন্দেহ। একজন বললো, এসব ব'লে কেন মিছিমিছি নিজের অবস্থা কাহিল করছ।

• সেই নীলচোখ চাষীটি জবাব দিলো, ওতো মরতেই চলেছে, তার চাইতে তো আর কাহিল করতে পারবে না।

সার্জেন্ট হঠাৎ আবির্ভূত হ'ল, এতো লোক কিসের? কে বক্তিমে করছে?

তারপর রাইবিনের দিকে এগিয়ে তার চুল ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো, তুই বক্তিমে করছিস? পাজী গুণ্ডা কোথাকার, তুই বক্তিমে করছিস?

জনতা তখনও শবের মতো শান্ত—যার বুকে অক্ষম বেদনার জ্বালা।

একজন চাষী ফেললো দীর্ঘনিশ্বাস। রাইবিন্ আবার ব'লে উঠলো, দেখছো তো ভাইসব?

চুপ ব'লে সার্জেন্ট তার মুখে একা ঘা দিলো।

রাইবিন ঘুরে পড়ে বললো, ওরা এমনি করে মানুষের হাত বেঁধে মারে, যা খুশি ক'রে নেয়।

ধরো ব্যাটাকে—ব'লে সার্জেন্ট রাইবিনের সামনে লাফিয়ে প'ড়ে উপর্যুপরি ঘুসি চালাতে লাগলো, মুখে, বুকে, পেটে।

এবার যেন জনতার ধৈর্যচ্যুতি হ'ল।

মেরোনা।· মারছো কেন? অকেজো পশু কোথাকার। ছিনিয়ে নিয়ে চলো ওকে।

সেই নীল-চোখ চাষাটি রাইবিনকে সংগে নিয়ে চললো টাউন-হলের দিকে। সার্জেন্ট গর্জন ক'রে উঠলো, খবর্দার নিয়ে যেয়োনা।

নীল-চোখ চাষীটি জবাব দিলো, না, নোব; নইলে তোমরা একে মেরে ফেলবে।

রাইবিন এবার বেশ জোর গলায় বললো, চাষীবন্ধুগণ, তোমরা কি বুঝতে পারছো না, কী শোচনীয় তোমাদের জীবন? তোমরা কি বুঝতে পারছো না, ওরা কেমন ক'রে তোমাদের লুণ্ঠন করে—প্রতারণা করে—রক্ত পান করে? এই দুনিয়াকে রক্ষা করছে কারা?—তোমরা। কাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্ব-ব্যাপী সভ্যতা?—তোমাদের ওপর। বিশ্বের সমস্ত-কিছুর মূলীভূত শক্তি কাদের মধ্যে?—তোমাদের মধ্যে। কিন্তু সেই তোমরা কি পেয়েছো?—পেয়েছো উপবাস। ওই তোমাদের একমাত্র পুরস্কার।

যথার্থ কথা ··আরো ব'লো, আরো' ব'লো, তোমার গায়ে হাত তুলতে দোবোনা। ওর হাত খুলে দাও।

না, থাক।

খুলে দাও, বলছি।

পুলিশরা ভয়ে হাত খুলে দিয়ে বললো, দিলে শেষটা পস্তাবে!

রাইবিন বললো, ভাইসব, আমি পালাবো না। পালিয়ে আমি আত্ম-গোপন করতে পারি কিন্তু সত্যকে কেমন ক'রে গোপন করবো? সে যে এইখানে·· আমার অন্তরে।

জনতা এবার যেন গরম হ'য়ে উঠলো। রাইবিন তার রক্ত-মাখা হাত ত্ব'খানা উর্ধ্বে তুলে বলতে লাগলো, ভাইসব, আমি দাঁড়িয়েছি তোমাদেরই জন্ম তোমাদেরই দাবি নিয়ে। এই দেখো আমার রক্ত—সত্যের জন্ম এ রক্ত পাত হয়েছে।—সেই সত্যের দিকে তোমরা নজর রেখো,—সেই বই পড়ো। কর্তারা, পুরুতরা বলবে, আমরা নাস্তিক ধ্বংসবাদী—তাদের কথায় বিশ্বাস কোরো না। সত্য চলেছে পৃথিবীর বুকের ওপর গোপন-পদ-সঞ্চারে, মানুষের মধ্যে খুঁজছে সে নীড়। কর্তাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে অগ্নি-তপ্ত ছুরিকার মতো—তারা একে সইতে পারে না—এ তাদের কেটে—পুড়িয়ে দিয়ে যাবে।—এ তাদের মরণ-শত্রু; তাই এর গতি গুপ্ত। কিন্তু এই সত্যই তোমাদের পরম মিত্র।

সাঁচ্চা কথা।—কিন্তু ভাই এরই জন্ম তোমার সর্বনাশ হ'বে।—

কে ধরিয়ে দিলো একে?

একজন পুরুত—একটি পুলিশ বললো।

এমন সময় পুলিশ-সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'লেন। জনতা কেমন যেন ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে তাকে পথ ক'রে দিলো। সাহেব এসেই রাইবিনের

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, ব্যাপার কি? এর হাতবাঁধা নেই কেন? এই বাঁধো ·

একজন পুলিশ বললো, বাঁধাই ছিলো হুজুর, ওরা খুলে দিলো।

সাহেব জনতার দিকে চেয়ে হুমকি দিয়ে বললেন, ওরা কারা? কোথায় সে লোক? তুমি? সুমাখভ ব'লে সেই নীল-চোখ চাষাটির বুকে তরবারির মুঠো দিয়ে দিলেন এক ঘা। আর তুমি? মিশিন বলে আর একজনের দাড়ি ধরে দিলেন টান। তারপর বাকি লোকগুলোকে তাড়া দিয়ে বললেন, ভাগ্ ব্যাটারা সাহেব যে খুব অগ্নি-শর্মা হ'য়ে উঠলেন তা নয়, সব যেন তিনি যন্ত্রের মতো করে যাচ্ছেন।

জনতা পালালো না, শুধু খানিকটে সরে সরে দাঁড়ালো।

সাহেব পুলিশটির দিকে চেয়ে বললেন, কিহে, হাত বাঁধছো না যে? ব্যাপার কি?

জবাব দিলো রাইবিন, আমি হাত বাঁধতে দিতে চাই না। কেন বাঁধবে? পালাচ্ছিওনা, লড়াইও করছিনা।

সাহেব তার দিকে এগিয়ে বললেন, কি বলছো?

রাইবিনও চড়া গলায় জবাব দিলো, বলছি তোমরা পশু—তাই মানুষকে এমন ভাবে নির্যাতিত করো। কিন্তু সাবধান, সেই রক্ত-দিবস অচিরেই আসছে সেই দিন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হবে এর।

কী, কি বললি পাজি, বদমাস। কি বললি—বলে সাহেব রাইবিনের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুসি দিলেন।

রাইবিন তার দিকে মুখ তুলে বললো, ঘুসি দিয়ে সত্যকে বধ করা যায় না কর্তা। আমি জানতে চাই কোন্ অধিকারে কুকুরের মতো কামড়াচ্ছো আমায়?

সাহেব আর এক ঘুসি ছুঁড়লেন, কিন্তু রাইবিন চকিতে সরে দাঁড়াতে সাহেব প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জনতার মধ্যে হাসির হররা বয়ে গেল। রাইবিন গর্জন করে বললো, খবর্দার, নরকের পশু গায়ে হাত তুলিসনি · আমি তোর চেয়ে দুর্বল নই চেয়ে দেখ্

সাহেব দেখলেন গতিক বড় ভাল নয়। লোকগুলো ক্রমশ ঘনিয়ে আসে তার দিকে। তখন এদিক-ওদিক চেয়ে ডাকলেন, নিকিতা!

ভিড় ঠেলে গাট্টা গোট্টা চেহারার একটি চাষী এসে সাহেবের সামনে দাঁড়ালো।

এই ব্যাটার কান প্যাঁচিয়ে বেশ একটি নম্বরি ঘুসি চালাও তো।

চাষীটি রাইবিনের সামনে গিয়ে ঘুসি পাকালো। রাইবিন নড়লোনা একটুকুও। সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে প্রগাঢ় স্বরে বললো, দেখো ভাইসব, পশুরা কেমন ক'রে আমাদের হাত দিয়েই আমাদের কণ্ঠরোধ করে। দেখো, দেখো একবার ভাবো কেন কেন এ আমাকে মারতে চায়? কেন? বলতে বলতে নিকিতার ঘুসি এসে পড়লো তার মুখে।

জনতা কোলাহল ক'রে উঠলো,—নিকিতা, পরকালের কথা একেবারে ভুলে ব'সে আছিস বুঝি!

সাহেব নিকিতার ঘাড়ে এক ঠ্যালা দিয়ে বললেন, আমার হুকুম, মারো।

নিকিতা একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে গম্ভীরভাবে বললো, আমি আর পারবোনা।

কী!

সাহেব রেগে আগুন হ'য়ে নিজেই রাইবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; তারপর দু'ঘুসিতে রাইবিনকে মাটিতে ফেলে বুকে, পাশে, মাথায় লাথি

হুঁড়তে লাগলেন। জনতাও পলকে উত্তেজিত হ'য়ে হুংকার দিয়ে এগিয়ে এলো সাহেবের দিকে। সাহেব ব্যাপার দেখেই তরবারি হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, বটে, দাংগা করছো তোমরা দাংগা করছো ?...তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবস্থা বেগতিক দেখে বললেন, বেশ, নিয়ে যাও, ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু জেনে রেখো, এ একজন রাজনৈতিক আসামী জারের বিরুদ্ধে একে তোমরা আশ্রয় দিচ্ছো তোমরাও তাহলে বিদ্রোহী

জনতা একথায় ভয়ানক দমে গেলো। তাদের সে উত্তেজনা দূর হ'য়ে স্বরে ফুটে উঠলো যেন মিনতির ভাব, বলতে লাগলো, দোষ করেছে আদালতে নিয়ে যাও মেরোনা মাপ কর ওকে এসব অত্যাচারের অর্থ কি ? দেশে কি এখন বে-আইনের রাজত্ব ? এমনি ক'রে সবাইকে ঠ্যাঙাতে শুরু করলেই হয়েছে আর কি শয়তানের দল, খালি মারধর শিখেছে।

জন-কয়েক চাষী রাইবিনকে মাটি থেকে তুললো। পুলিশরা আবার তার হাত বাঁধতে গেলো।

জনতা বাধা দিয়ে বললো, একটু সবুরই কর না।

রাইবিন হাত দিয়ে রক্ত মুছে দাঁড়াতেই দেখলো, মা ভিড়ের মধ্যে। মার সংগে ইংগিত-বিনিময় ক'রে পাশে দাঁড়ানো সেই নীল-চোখ চাষীর সংগে বাক্যালাপ ক'রে রাইবিন জনতাকে সম্বোধন করে বলে উঠলো, সাহস এবং আশা-ভরা কণ্ঠে, বন্ধুগণ, কোনো ভয় নেই। আমি দুনিয়ায় একা নই। আর সত্যকেও ওরা গ্রেপ্তার করতে পারবে না আমি যাবো, কিন্তু আমার স্মৃতি থাকবে একটি নীড় ওরা নষ্ট ক'রে দেয় দিক ; আরো বহু নীড়, বহু বন্ধু, বহু সংগী আছে আমার তারা সত্যের নব নব নীড় রচনা করবে। তারপর একদিন বেরোবে তারা মুক্তির অভিযানে। মানুষকে করবে মুক্তি-প্রভায় সমুজ্জ্বল।

সাহেবের স্বর তখন অনেকটা নরম হ'য়ে এসেছে বললেন, আমি মেরেছি বলেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে হাত তুলবে? এতো সাহস তোমাদের?

কেন?· ·তুমি কোন্ স্বর্গ থেকে নেবে এসেছো? রাইবিন জবাব দিলো। তারপরই আবার শুরু হল জনতার কোলাহল।

তর্ক কোরোনা। তুমি কাদের বিরুদ্ধে লেগেছো, জানো? সরকারের।

রাগ করবেন না হুজুর। ওর মাথার ঠিক নেই।

শহরে নিয়ে যাবে তোমায়।

সেখানে সুবিচার পাবে।

পুলিশরা রাইবিনকে নিয়ে টাউন-হলের মধ্যে চলে গেলো।

চাষীরাও যে যার বাড়ি চলে গেলো।

তারপর একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো টাউন-হলের সামনে। রাইবিনকে হাত-বাঁধা অবস্থায় এনে ঠেলে ভ'রে দেওয়া হলো তার মধ্যে। রাত্রির সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে বেজে উঠলো রাইবিনের কণ্ঠস্বর, বিদায়, বিদায় বন্ধুগণ! সত্য সন্ধান করো, সত্য রক্ষা করো, সত্য-সেবক যে তাকে বিশ্বাস করো, সাহায্য করো, সত্যব্রতে আপনাকে উৎসর্গ করে দাও কিসের জন্য দুঃখ করছো তোমরা? এ জীবন তোমাদের কি দিয়েছে? কেন তোমরা মরতে বসেছো অনাহারে? মুক্তির জন্য বুক বেঁধে দাঁড়াও। মুক্তি তোমাদের মুখে অন্ন দেবে। সত্যের উদ্বোধন করো

বলতে বলতে গাড়ি চোখের সামনে অদৃশ্য হোলো, রাইবিনের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হ'য়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো।

এগারো

মা সরাইয়ে ফিরে এলেন। ক্ষুধা নেই, খাবার পড়ে রইলো প্লেটে। কেবল চোখের ওপর নাচতে লাগলো রাইবিনের সেই নির্যাতন।

পরিচারিকাটি এসে বললো, বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে, উঃ, পুলিশ সাহেব কী মারটা মারলে! আমি কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সব-কটা দাঁত ভেঙে গেছে থুথু ফেললো, পড়লো ভাঙা দাঁত আর রক্তের চাপ। চোখ এতো ফুলে উঠেছে যে, তা দেখা যায় না। ওরা বললো, দলে আরো লোক ছিল · এ ছিল নেতা তিনজনকে ধরেছিল একজন পালিয়েছে এরা নাকি ঈশ্বর মানেনা; লোকজনকে বলে, গির্জা লুঠ করো এমনি লোক এরা। অনেকে চোখের জল ফেললো ওদের জন্তে আবার কোনো হতভাগা বলে কিনা, বেশ হয়েছে, বাছাধনেরা একেবারে ঠাণ্ডা! কী নিচু অন্তঃকরণ দেখেছেন?

মা বুঝলেন, টাউন-হলের ভিতর নিয়ে গিয়ে রাইবিনকে আরো একচোট মারা হয়েছে। চুপ ক'রে রইলেন তিনি। দরদী শ্রোতা পেয়ে মেয়েটি বলতে লাগলো, বাবা বলেন, অজন্মার দরুণ এসব হয়। পরপর এই দু'বছর অজন্মা। লোকজন হয়রান্ হ'য়ে গেলো।···তাই এসব হাংগামা। এই তো সেদিন ভসিনকভের যথাসর্বস্ব বিকিয়ে গেলো দেনার দায়ে। মরিয়া হ'য়ে শেষে বেচারা বেলিফের মুখে লাগালো এক ঘুসি, বললো, এই নাও তোমার পাওনা।

নীল-চোখ চাষীটি এসে হাজির হ'লো। মা তার সংগে ইতিমধ্যেই কথা বলে বুঝেছেন, সেও তাদের দলের লোক; কাজেই তার ওখানে রাত্রিবাস

করা স্থির করেছেন। চাষীটি মেয়েটিকে বললো··ওকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেয়ো। তারপর মার ব্যাগটা তুলে নিয়ে মুচকি হেসে বললো, একদম খালি যে এটা আমি নিয়ে গিয়ে সাবধান ক'রে রাখছি। আপনি ওর সংগে আসুন, বলে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলো।

খানিকবাদে মাও মেয়েটির সংগে চাষীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। ছোট্ট একখানি ঘর, কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝকে। এককোনে টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। মাকে অভ্যর্থনা ক'রে চাষী-বউকে বললো, তেতিয়ানা, যাও, শীগগির পিওরকে ডেকে আনো।

তেতিয়ানা চ'লে যেতে মা জিগ্যেস করলেন, আমার ব্যাগ?

নিরাপদ জায়গায় আছে। মেয়েটি সামনে ছিল ব'লে খালি বলেছিলুম · নইলে ওতো দেখছি বেজায় ভারি।

তাতে কি হল?

তারপর উঠে মার কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো, সেই লোকটাকে চেনেন আপনি?

মা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ।

তা-ই আন্দাজ করেছিলুম। তাকেও জিগ্যেস করতে বললো, আরো অনেকে আছে আমাদের দলে। বেশ লোক রাইবিন। আচ্ছা আপনার ও ব্যাগে তো বই আর কাগজ আছে, না?

হাঁ, ওদের জন্যই নিয়ে এসেছিলুম।

আমাদের হাতেও বই-কাগজ পড়েছিল···আমরাও ওই চাই।···খাঁটি কথা লিখেছে আমি নিজে বড়-একটা পড়তে পারি না—আমার এক বন্ধু পারে। তাছাড়া আমার বউও প'ড়ে শোনায়। তা, বইকাগজগুলোর ব্যবস্থা কি করবেন?

তোমাদের দিয়ে যাবো।

চাষী শুধু বললো, আমাদের। কিন্তু কোনো রকম আশ্চর্যের ভাব দেখালো না।

রাইবিনের কথা ভেবে মার চোখ বারে-বারেই অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠছে। কিন্তু কণ্ঠ তার অকম্পিত, বললেন, মানুষের যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তার কণ্ঠ রোধ ক'রে তাকে পায়ে মাড়িয়ে যায় ঐ ডাকাতের দল। প্রতিবাদ করলে জবাব মেলে প্রহার এবং নির্যাতন।

চাষী বললো, শক্তি শক্তি ওদের বেশি কিনা।

মা উত্তেজিত স্বরে বললেন, কিন্তু সে শক্তি ওরা পেলো কোত্থেকে? এই আমাদেরই কাছ থেকে। যা-কিছু তাদের, সব আমাদের কাছ থেকেই পাওয়া।

চাষী বললো, সে কথা ঠিক। একটা চাকার মতো আর কি। আমরা চালাই অথচ আমরাই তাতে কাটা পড়ি। ঐ আসছে।

কে?

আমাদের দলেরই লোক। ওর কাছেই ব্যাগটা রেখেছি।

বউ একটি চাষীকে নিয়ে এলো। এই পিওর। পিওরকে বসতে দিয়ে বউ মাকে লক্ষ্য ক'রে স্বামীকে জিগ্যেস করলো, উনি খাবেন না স্টিপান?

মা বললেন, না, মা।

পিওর একটু বেশি কথা বলে। মার সংগে মিনিটখানেকের মধ্যেই সে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলো। রাইবিনের কথা উঠতে প্রশ্ন করলো, সে কি আপনার আত্মীয় কেউ?

আত্মীয় নয় · বহুদিনের পরিচিত দাদার মতো ভক্তি করি।

অর্থাৎ বন্ধু।—চরিত্রবান্ লোক বটে! আর নিজের কদর বোঝে একটা লোকের মতো লোক, বুঝলে তেতিয়ানা!

তেতিয়ানা জিগ্যেস করলো, বিয়ে করেছে?

কৃত-দার।

তাই এতো সাহস। বিবাহিতেরা এতো সাহস দেখাতে পারেনা।

পিওর বললো, কেন আমি? ·

তেতিয়ানা ঠোঁট উলটে বললো, তুমি? কাজ তো করছো ভারি? খালি বকর-বকর, আর ঘরের কোনে বসে এক-আধখানা বই পড়ে ফিস্ ফাঁস।

পিওর আহত হ'য়ে প্রতিবাদ করলো, কেন, মেলা লোকতো শোনে আমার কথা। এটা বলা তোমার উচিত হলনা বৌদি।

তেতিয়ানা সে কথা কানে না তুলে বললো, তা ছাড়া, চাষীরা আবার বিয়ে করে কেন? একজন চাকরানীর দরকার—তাই। কাজ কি তার?

স্টিপান বললো, সে কি বউ; কাজের কি কোনো কমতি আছে তোমার?

ছাই কাজ। এ কাজ করে লাভ? ছেলে-মেয়ে বিয়ানো, অথচ তাদের যত্ন করার ফুরসুৎ নেই খাওয়ানোর কড়ি নেই। খালি খেটে মর। আমারও মা দুটি ছেলে ছিল একটি দু'বছর বয়সে ফুটন্ত জলে পড়ে মারা যায়। আর একটি মারা পড়ে, এই পোড়া খাটুনির ফলেই। আমি বলি, চাষীরা যেন বিয়ে না করে, হাত না বাঁধে। তাহ'লেই তারা সত্যের জন্য খোলাখুলি লড়াই চালাতে পারবে। তাই নয় মা?

হাঁ।

তারপর মা আবেগের সংগে বিপ্লব কাহিনী, নামজাদা বিপ্লবীদের জীবনী এবং কার্য-প্রণালী ও দেশ-বিদেশের মজুর-প্রগতির কথা চাষীদের কাছে বর্ণনা ক'রে গেলেন।

তেভিয়ানা বললো, তাইতো আমি ওকথা বলি, মা। তারা আর আমরা! আমরা তো জীবন কাটাচ্ছি ভেড়ার মতো। এই তো ধরুন, আমি লিখতে পড়তে জানি, বই পড়ি আর ভাবি, এমনও অনেকদিন হয় যে ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু লাভ? না ভাবলে জীবনটা ঠেকে ফাঁকা, আর ভাবলেও জীবনটা ফাঁকাই ঠেকে। পৃথিবীর কোন-কিছুর যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই যে চাষীরা দিনরাত খেটে মরে এক টুকরো রুটির জন্য, কিন্তু কি পায়? কিছুই না। তাইতো দুঃখ পায়, রেগে ওঠে মদ খায়, মারামারি করে, তারপর আবার কাজ করে। কাজ কাজ…কাজ কিন্তু কাজ করে লাভ? বিন্দুমাত্র না।

স্টিপান হঠাৎ বললো, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আলোটা নিভিয়ে দেওয়া ভাল।

পিওর বললো, হাঁ সতর্ক থাকবে বৈকি, স্টিপান।

স্টিপান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে বললো, কিন্তু আমি আমার কথা বলিনি। আমার মতো মানুষের দামই বা কি! একশো এক আনা।

মা বললেন, ভুল করছো তুমি। বাইরের লোক তোমায় শোষণ করায় যার স্বার্থ সে তোমার যে দাম কষবে, তা গ্রাহ্য নয়। তোমার দাম কষবে তুমি নিজে।

পিওর বিদায় নিয়ে চ'লে গেলো। তেভিয়ানা মাকে বিছানা পেতে দিতে দিতে বললো, আজকাল চাই মানুষের মধ্যে এই বিদ্রোহকে উসকে দেওয়া। ভাবে তো সবাই, কিন্তু গোপনে, নিজের মনে। তাতে চলবে না।

মানুষকে মুক্তকণ্ঠে জোর গলায় বলতে হবে। আর, একজনকে প্রথম এই কাজে ব্রতী হ'য়ে পথ দেখাতে হবে। কতকগুলি অসংবদ্ধ ছাড়া-ছাড়া চিন্তায় চলবে না, একটা কর্তব্য স্থির ক'রে কাজের সূত্রে সেগুলিকে গেঁথে তুলতে হবে।

বিছানা পাতা হ'লে মা শুয়ে পড়লেন। তেতিয়ানা বললো, আপনিও প্রার্থনা করেন না?—আমিও মনে করি, ভগবান নেই, মানুষকে বোকা বানাবার জন্য এসবের আমদানি হয়েছিল।

মা বললেন, আমি যীশুতে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভগবান্? জানি না। তিনি যদি থাকবেনই তাহ'লে তাঁর মংগল-শক্তি হ'তে আমরা বঞ্চিত কেন? কেন তিনি মানুষকে দুটো ভাগে বিচ্ছিন্ন হ'তে দিলেন? কেমন ক'রে তাঁর রাজ্যে সম্ভব হ'ল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং উপহাস, অন্যায় এবং পাশব আচরণ?

আমার সন্তান দু'টির মৃত্যুর জন্য দায়ি যে—মানুষই হ'ক আর ঈশ্বরই হ'ক—আমি তাকে কখনো ক্ষমা করবোনা কখনো না।

মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার তো ছেলে হবার বয়স যায়নি, মা।

তেতিয়ানা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে বললো, না, মাঁ, ডাক্তার বলেছে আর আমার ছেলে হবে না।

এই রিক্ত-সন্তান নারীর বুকের ব্যথা বুঝে মা নিরব হ'য়ে রইলেন।

স্বামী স্ত্রী মাকে শুইয়ে রেখে নিজেরাও শুয়ে পড়লো।

বারো

শুয়ে শুয়ে মা স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন শুনতে লাগলেন।

তেতিয়ানা বলছে, বুড়িরা পর্যন্ত একাজে ঝাপিয়ে পড়লো, আর তুমি!

স্টিপান বললো, আহা, এসব কাজ এত তাড়া-হুড়োয় হয়না। বেশ ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখা চাই।

হাঁ, ভাবতে তো তোমার আগাগোড়াই দেখছি।

স্টিপান বললো, আহা, তুমি বুঝতে পারছোনা, কাজ করতে হ'বে এই রকম ক'রে—প্রথমে, যারা অন্যায় সয়েছে, অত্যাচার সয়েছে, তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে দলে ভাগাও। তারপর আমি শহরে যাবো—কাঠ কেটে খরচ চালাবো, আর ওদের খুঁজে নিয়ে ওদের সংগে কাজে যোগ দেবো খুব সন্তর্পণে চলবে এ ব্যাপার। আর সত্যিই, নিজের দাম নিজে কষবে। ঐতো রাইবিন পুলিশ কমিশনার তো দূরের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরের সামনে দাঁড় করালেও ও দমবেনা। তারপর নিকিতা হঠাৎ ওর মন বদলে গেলো কি করে? এ কি যাদু? না। মানুষ যদি বন্ধুভাবে মিলে মিশে কিছু করে, সবার কাছে তাতে সহানুভূতি পায়।

তেতিয়ানা ব'লে উঠলো, বন্ধুভাবে! চোখের সামনে একটা লোককে মারবে আর আমরা থাকবো হা করে দাঁড়িয়ে।

স্টিপান বললো, সবুর। তার ভগবানকে ধন্যবাদ দেওা উচিত যে আমরা নিজেরা তাকে মারিনি। কর্তারা তো আমাদের বাধ্য করেই এমনি মারতে প্রাণ যতই কাঁদুক, ঘুসি তোমার চালাতেই হবে, হুকুম না তামিল করো, তোমার মরণ। কর্তাদের বিরুদ্ধে মানুষ হোয়োনা, এ বাদে শেয়াল-কুকুর

যা-খুশি হতে পারো। বীর হ'লে তো তোমার রক্ষা নেই ভবসাগর পার ক'রে দেবার জন্ত তারা উঠে প'ড়ে লাগবে। বুঝলে তেভিয়ানা! চাই আজ অত্যাচারিত জন-সাধারণের ক্রোধ এবং বিদ্রোহ।

পরদিন মা শহরে চলে এলেন। এসে দেখেন বাসা সার্চ হয়ে গেছে· · সব জিনিস তছনছ। আইভানোভিচ বললো, শাসিয়ে গেছে মা, আমার কাজ খতম হবে। বাঁচা গেলো। চাষীদের কার কি নেই এ হিসেব ক'রে মাইনে গোনা দস্তরমতো হারামি।

তারপর মা রাইবিনের শোচনীয় গ্রেপ্তার-কাহিনীর বর্ণনা করলেন। আইভানোভিচ প্রথমটা উত্তেজনায় লাল হ'য়ে উঠলো, তারপর দীপ্ত চোখে কিন্তু সংযত কণ্ঠে বললো, চমৎকার লোক! এমন মহৎ! কিন্তু জেলে থাকা ওর পক্ষে কষ্টকর, ও রকম লোক জেলে গিয়ে সুস্থ থাকে না।

তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, আর! ঐ পুলিশ এবং সার্জেন্ট, ওরা তো শয়তানের হাতের অস্ত্র পশুকে যেমন পোষ মানায়, ওদেরও তেমনি ক'রে পোষ মানানো হয়েছে। হাঁ, পশু ওরা···আর পশু যখন কামড়ায়, তখন তাকে করতে হয় উত্তেজনায় আইভানোভিচ পাইচারি করতে করতে রাগ-ভরা কণ্ঠে বলতে লাগলো, কী ভয়ানক! মানুষের ওপর অন্যায় কর্তৃত্ব-মদে মত্ত হ'য়ে মুষ্টিমেয় পশু মানুষকে মারছে, অত্যাচার করছে, গলা টিপে খুন করছে। বর্বরতার সুর উঁচু হতে উঁচুতে উঠছে, নিষ্ঠুরতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের নীতি। একটা গোটা জাতি আজ অধঃপাতিত। একদল করছে অত্যাচার। একদল এই অত্যাচার নিরবে স'য়ে মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে, আর একদল হুংকার করছে—প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ। ·

নিষিদ্ধ কাগজ-পত্রের কথা উঠলে মা কেমন ক'রে তা ছড়াবার বন্দোবস্ত

ক'রে এসেছেন তা বললেন। আইভানোভিচ আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে 'মা মা' ব'লে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, চাষীরাও তাহ'লে ন'ড়ে উঠেছে!

হাঁ। পেভেল, এণ্ড্রি যদি এখন থাকতো!

আইভানোভিচ বললো, তুমি শুনে হয়তো প্রাণে খুব আঘাত পাবে মা, কিন্তু পেভেল জেল পালাবে না। সে চায় বিচার। তারপর নির্বাসনদণ্ড হ'লে সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসবে।

মা বললেন, তাই করুক তবে। কিসে ভালো হবে, সে-ই বেশি বোঝে।

আইভানোভিচ বললো, রাইবিনের সম্বন্ধে একটা ইস্তাহার বের করা দরকার। আমি আজই লিখবো। কিন্তু গ্রামে পাঠাবো কি ক'রে?

কেন, আমি নিয়ে যাবো।

না, মা। তোমার আবার যাওয়া ঠিক হ'বে না। এবার বরং নিকোলাই যাক।

আইভানোভিচ ইস্তাহার লিখে দিলো। মা তা লুকিয়ে রাখলেন গায়ের জামার মধ্যে ফুরসুৎ মতো ছাপাতে দিয়ে আসবেন ব'লে।

তেরো

পরদিন ভোরে অপ্রত্যাশিতভাবে ইগ্নাতি এসে হাজির হলো। তাদের দলের পাঁচজন ধরা পড়েছিল! বাকি-সব কেউ পালিয়েছে, কেউ পুলিশের সন্দেহে পড়েনি।

পুলিশের সাড়া পেয়েই ইগ্নাতি ঘর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ঝোপ এবং বনের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে শহরের দিকে ছুটেছে। সাত দিন পরে সে হয়ে এসে পৌঁছলো। হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেছে, তবু তার মন খুশি। জুতো খুলে সে একটুকরো কাগজ বের ক'রে মার হাতে দিলো—রাইবিন লিখেছে মাকে চিঠি আমাদের আরো বই চাই, আরো ইস্তাহার চাই। সেই মহিলাটিকে আমাদের জন্ত লেখা পাঠাতে বলবেন।

রাইবিনের চিঠি প'ড়ে মার চোখে জল এলো, তার গ্রেপ্তারের সেই করুণ কাহিনী ইগ্নাতিকে শোনালেন তিনি।

তারপর ইগ্নাতির ফুলো পায়ের দিকে চেয়ে আইভানোভিচকে তিনি বললেন, ওর পায়ে একটু অ্যালকোহল মালিশ করা দরকার।

আইভানোভিচ বললো, নিশ্চয়।

সে অ্যালকোহল নিয়ে এলো। মা ইগ্নাতির পা ধু'য়ে অ্যালকোহল মালিশ ক'রে দলেন।

ভদ্রলোক আইভানোভিচ যে তার মতো ছোটলোকের ওপর এতোটা দরদ দেখাবে ইগ্নাতি তা কল্পনাও করতে পারেনি। কাজেই সে অতিমাত্রায় মুগ্ধ এবং অবাক হ'ল। আইভানোভিচ আড়ালে গেলে বললো, আশ্চর্য ব্যাপার!

কি আশ্চর্য ব্যাপার ?

এই—একদিকে ওরা মুখে ঘুসি চালায়, আর একদিকে ধোয়ায় পা। মাঝখানে ? মাঝখানে কি ?

আইভানোভিচ হঠাৎ দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললো, মাঝখানে একদল লোক যারা প্রহারকর্তার হাতে চুমু খায়, আর প্রহৃতের রক্ত শোষণ করে।

ইয়াতি সসম্ভ্রমে তার দিকে চেয়ে বললো, তাই ঠিক।

চা খেতে ব'সে সে বললো আমার কাজ ছিল, কাগজ বিলি করা—হাঁটতে ওস্তাদ ছিলুম কিনা, তাই রাইবিন এই কাজের ভার দিয়েছিল।

আইভানোভিচ জিগ্যেস করলেন, লোকে কি খুব পড়ে ?

হাঁ খুব—যারা পারে। এমন কি অনেক ধনীও পড়ে, তবে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নয়। আমরা এ ছড়াই জানলেই শ্রীঘর—এ যে তাদের মরণ-ফাঁদ।

মরণ-ফাঁদ কেন ?

তা ছাড়া কি ? চাষীরা এখন আর জমিদারের তোয়াক্কা না রেখে নিজেরাই জমি বিলি-বন্দোবস্ত করতে শুরু করছে। ধনীরা কি জমি কামড়ে ব'সে থাকতে পারবে ? চাষীরা রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে ধনীদের—মুনিবও থাকবে না, মজুরও থাকবেনা দুনিয়ায়। এ হাংগামাকে কে ডেকে আনে, বলো ?

রাইবিনের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ইস্তাহার বিলির কথায় ইয়াতি সাগ্রহে ব'লে উঠলো, আমায় দিন, আমি যাচ্ছি। বনের মধ্যে একটা জায়গায় রেখে সবাইকে বলবো, যাও, ঐখানে গিয়ে নিয়ে এসো। আমিও ধরা পড়বোনা, কাজও হ'তে হ'বে।

আইভানোভিচ বললো, না বন্ধু, তুমি না। যাবো আমি, তুমি শুধু আমাকে সব খবরাখবর বাৎলে দেবে।

ইয়াতি তাতেই রাজি হ'ল। ফন্দি-ফিকির বাৎলে দিতে দিতে বললো, জানলায় চারটে ঘা দেবে। পয়লা তিনটে—তারপর একটু থেমে আর একটা। একজন লাল-চুল চাষী দোর খুলে দিলে তুমি বলবে, ধাই কোথায়, ওদের কাছ থেকে এসেছি—বাস, ওই টুকুই বলবে। তাহলেই বুঝবে সব।

আইভানোভিচ চ'লে গেলো।

ফেরারী নিকোলাইর পক্ষে চোরের মতন লুকিয়ে-সুকিয়ে বেড়ানো আর নিষ্কর্মা-জীবন যাপন করা হয়েছিল অসহ্য। কাজেই রাইবিনকে জেল থেকে মুক্ত করার বন্দোবস্তে সেই হ'ল প্রধান উৎসাহী।

পরিচালনার ভার নিলে শশেংকা, আর তাদের সংগে যোগ দিলো গভুন—গভুনের স্বার্থ, তার ভাইপো ও এই সংগে মুক্ত হ'বে। মাও সংগে গেলেন নেহাৎ যেচে—প্রাণের ঠানে। জেলের সেদিকটা গোরস্থান, নির্জন, অনেকটা ফাঁকা। সে দিকে চললেন মা। পথে দু'জন সৈনিকের সংগে দেখা—মা অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বললেন, হাঁগা, আমার ছাগল দু'টি হেথা কোন্ দিকে গেল, দেখেছো?

না।

সৈন্যরা চ'লে গেলে মা নির্ধারিত স্থানটিতে এসে দাঁড়ালেন। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হ'ল। মা কেঁপে উঠলেন। ঐ আসছে। জেলের দেয়ালের গা ঘিসে একটি ল্যাম্পপোস্ট।

একটি লোক বাতিওয়ালার মতো পা ফেলে ফেলে ল্যাম্প-পোস্টের কাছে এলো। তার কাঁধে একটা দড়ির সিঁড়ি। বেশি ব্যস্ততা না দেখিয়ে সে

সিড়িটা দেয়ালে আটকে অতি সহজভাবে বেয়ে ওপরে উঠে দাঁড়ালো, হাত দুলিয়ে ইংগিত করলো, তারপর তর তর ক'রে নেবে এসে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। সংগে সংগে জেলের ভেতর থেকে দেয়াল টপকে বাইরে নেবে এলো রাইবিন এবং গডুনের ভাইপো। তাদেরও অদৃশ্য হ'তে বেশি দেরি হলো না।

পরক্ষণেই জেলের পাগলা ঘন্টা বেজে উঠলো পুলিশ ছুটছে, সৈন্য ছুটছে মহা হুলস্থুল।

একটা পুলিশ ছুটতে ছুটতে মাকে এসে প্রশ্ন করলো, এই বুড়ি একটা লোক কালো দাড়ি তার তাকে এখান দিয়ে পালাতে দেখেছিস?

হাঁ, বাবা। ওই দিকে গেলো ব'লে মা উলটো দিক দেখিয়ে দিলেন। সে মহোৎসাহে সেদিক চ'লে গেলো!

মাও বাড়ি চ'লে এলেন।

হপ্তাখানেক পরে আদালত লোকে লোকারণ্য। আজ মামলা শুরু। আসামীদের আত্মীয়েরা ভিড় ক'রে এসে বসেছে। মা বসেছেন কম্পান্বিত হৃদয়ে, শিজভের পাশে। বিচার-মঞ্চের পেছনের দুয়ার খুলে বিচারকর্তা এলেন। সবাই উঠে দাঁড়ালো। তার পরই এলো অন্য এক দুয়ার দিয়ে রক্ষী-সমেত পেভেল, এণ্ড্রি, মেজিন, গুসেভরা বাপ-ছেলে, স্তামরলভ, বুকিন্, শোমোভ এবং আরো পাঁচজন যুবক—মা তাদের নাম জানেন না।

পনেরো

মামলা শুরু হলো বিচারকদের একজন একটা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন। উকিলরা যেন তা শোনার তেমন দরকার বোধ না ক'রে আসামী-দের সংগে কথা বলতে লাগলো।

হঠাৎ পেভেলের তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সবাই চমকিত হ'য়ে নির্বাক হ'য়ে গেলো···এখানে কোনো আসামী বা জজ নেই· এখানে আছে শুধু বন্দী এবং বিজেতা।

জজ যেন উদাসভাবে বললেন, তারপর, এণ্ড্রি নাখোদকা, তুমি কি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ?

এণ্ড্রি সটান দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিয়ে চোখের কোন দিয়ে চেয়ে বললো, আমার অপরাধ? কি করেছি আমি? চুরিও করিনি, খুনও করিনি। আমি শুধু বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি তেমি জীবন-যাত্রার, যাতে মানুষ বাধ্য হয় পরস্পর হানাহানি এবং রাহাজানি করতে।

জজ বললেন, সংক্ষেপে জবাব দাও, 'হাঁ', কি 'না'?

এণ্ড্রিও সমান স্পর্ধার সংগে কি একটা জবাব দিলো। শ্রোতৃমণ্ডলী তাতে বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। আসামীদের দিকে সবারই প্রশংসমান দৃষ্টি।

ফেদিয়া মেজিন, তুমি জবাব দাও।

মেজিন একলাফে উঠে দাঁড়ালো, জবাব আমি দেবোনা, দিতে চাইনা। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে আমি অস্বীকৃত। কোনো-কিছু বলার ইচ্ছে নেই আমার। তোমাদের আদালতকে আইনসংগত ব'লে আমি

আমি মনে করি না। কে তোমরা? তোমাদের কী একার আছে আমাদের বিচার করার? সে অধিকার কে দিয়েছে তোমাদের? জনসাধারণ? না। আমি তোমাদের চিনি না। ব'লে সে টপ ক'রে ব'সে পড়লো।

এরপর অভিনয়ের অন্যান্য দৃশ্যগুলি পর-পর অভিনীত হ'তে লাগলো। জজদের মন্তব্য, সরকারি উকিলের আলোচনা, শেখানো-পড়ানো সাক্ষীদের সাক্ষ্য। কিছুকালের জন্য আদালত ভংগ ·তারপর সেসন আরম্ভ।

শুরুতেই সরকারি উকিলের চার্জ-সীট দাখিল। অভিযুক্ত আসামীরা সদাহাস্য, নির্বিকার, তেজস্বী। জজরা যেন অসীম ঔদাসীন্য এবং নির্বিকার-তার এক-একটি ডিপো। সরকারি উকিলের লম্বা বক্তৃতা শোনার ধৈর্য যেন তাদের ছিল না।

সরকারি উকিলের পর আসামী পক্ষের উকিলদের ডাক পড়লো।

একজন উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, জীবন্ত শক্তিমান পুরুষ যে, যার অ নুভূতি আছে, সাধুতা আছে, সে কখনও যথাশক্তি বিদ্রোহ না ক'রে পারে না এই প্রাণহীন, প্রবঞ্চনাময়, মিথ্যাভরা জীবনের বিরুদ্ধে, সে কখনো না-দেখে পারে না এই জলন্ত বৈষম্য

সাবধান হ'য়ে কথা বলুন।

উকিল বিন্দুমাত্র না দমে সমানভাবে বক্তৃতা চালাতে লাগ্‌লেন। ফলে সরকারি উকিল বেশ একটু গরম হ'য়ে উঠলেন, আর সংগে সংগে মেতে উঠলো আসামীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতৃদল।

হঠাৎ সব চুপচাপ। পেভেল উঠে দাঁড়িয়েছে। মা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

পেভেল বলতে লাগলো, দলের লোক হিসাবে আমি মানি একমাত্র আমাদের দলের আদালতকে। এই আদালতে তাই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করবো না। আমি শুধু আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করব, যা আপনারা বোঝেন না। সরকারি উকিল বললেন, সাম্যবাদের পতাকাতলে আমাদের এ জাগরণ নাকি কর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমরা নাকি জার-দ্রোহী ছাড়া কিছুই নই। আমি আজ আপনাদের কাছে বলতে চাই যে, আমাদের দেশের বন্ধন-শৃংখল একমাত্র জার নয় তবে সর্বপ্রথম এবং সর্বঘনিষ্ট বন্ধন হিসাবে তাকে আমরা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য। আমরা সাম্যবাদী অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ফলে মানুষে মানুষে বৈষম্য, হানাহানি, স্বার্থের সংঘাত এবং এই স্বার্থ-সংঘাত মিথ্যা দিয়ে ঢাকার অথবা সমর্থন করার চেষ্টা অসত্য, শঠতা, ঈর্ষা-দুষ্ট সমাজের আবির্ভাব আমরা সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির শত্রু। যে সমাজ মানুষের দাম কষে শুধু ধনোৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে, সে সমাজকে আমরা বলি অমানুষিক, সে সমাজ আমাদের বিরোধী, এর নীতির সংগে আমরা বনিবনাও ক'রে চলতে পারি না, এর দুমুখো মিথ্যাবহুল হৃদয়হীনতা, মানুষের ওপর এর নিষ্ঠুর সম্পর্ক আমাদের কাছে অসহ্য। আমরা যুদ্ধ ক'রতে চাই, যুদ্ধ করব এ সমাজের প্রত্যেক কায়িক এবং নৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে; স্বার্থান্বেষীদের বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা মজুর·· দুনিয়ার সমস্ত-কিছু সৃষ্টির মূলে আমাদের শ্রম বিরাট যন্ত্র হ'তে শুরু করে শিশুর হাতের খেলনাটি পর্যন্ত আমাদেরই তৈরি। সেই আমরা মনুষ্যোচিত মর্যাদা-রক্ষাকল্পে যুদ্ধ করার অধিকার হ'তে বঞ্চিত। সবাই আমাদের খাটিয়ে নিতে চায়, খাটিয়ে নিতে পারে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র-হিসাবে। আজ আমরা চাই সেই সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তিকে জয় করবার মতো স্বাধীনতা। আমাদের মন্ত্র সহজ। মানুষের জন্য সমস্ত শক্তি, মানুষের জন্য সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্র, সমস্তের ওপর

বাধ্যতা-মূলক কাজ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা আইনদ্রোহী নই।

একজন জজ বললেন, কাজের কথা বল।

পেভেল স্পষ্টস্বরে বলতে লাগলো, আমরা বিদ্রোহী। ততদিন বিদ্রোহী থাকবো, যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, যতদিন কেউ শুধু হুকুম চালায়, কেউ কেবল তার হুকুম খাটে। যে-সমাজের স্বার্থরক্ষাকল্পে আপনারা নিযুক্ত, আমরা তার মরণ-শত্রু। আমরা জয়ী না হওয়া পর্যন্ত তার সংগে কোনো আপোষ আমাদের হ'তে পারে না। আমরা মজুররা জয়ী হবোই। সমাজ নিজেকে যতখানি শক্তিমান মনে ক'রে, আদৌ সে-ততখানি শক্তিমান নয়। যে সম্পত্তি সৃষ্টি এবং রক্ষাকল্পে লক্ষ লক্ষ লোক আজ দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ, যে বলপ্রভাবে সমাজ আজ মানুষের ওপর এতো শক্তিসম্পন্ন, তা-ই শ্রেণীতে শ্রেণীতে আজ জাগিয়ে তুলেছে এতো সংঘাত, ব'য়ে আনছে মানুষের কায়িক এবং নৈতিক মৃত্যু। দুনিয়ায় আজ যে এতো শক্তির অপব্যবহার তা শুধু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার দুরূহ চেষ্টার দরুণ। আর বাস্তবপক্ষে আমাদের চাইতে বড় গোলাম আপনারা···আমাদের বদ্ধ দেহ, আর আপনাদের বদ্ধ মন। সংস্কার এবং অভ্যাসের যে জগদ্দল পাথরের তলে প'ড়ে মন আপনাদের পিষ্ট, তা হ'তে মুক্ত হবার সাধ্য আপনাদের নেই। কিন্তু মনকে মুক্ত করার পক্ষে কোনো বাধাই নেই আমাদের। আপনারা বিষ ঢেলেছেন আমাদের বাইরে, কিন্তু আমাদের মনে চলেছে তার চেয়েও প্রবলতর এ প্রতিক্রিয়া···তাই-ই আজ, ক্রম-বর্ধমান অগ্নিশিখায় জ্ব'লে উঠেছে আমাদের মধ্যে ; শুধু তাই নয়, আপনাদের শক্তিও নিচ্ছে শুষে। তার ফলে, মানুষ আদর্শের জন্য যেমনভাবে লড়াই করে, আপনাদের ক্ষমতার জন্য তা আপনারা পারছেন না। ন্যায়দণ্ড থেকে আত্মরক্ষার যত রকম যুক্তি

হ'তে পারে, সব আপনাদের এরি মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। ভাবের জগতে নতুন কোন-কিছু আর সৃষ্টি করতে পারেন না আপনারা, ভাব-জগতে আপনারা দেউলে। নব-ভাবের ভাবুক আমরা, উত্তরোত্তর দীপ্ত হ'য়ে উঠছে আমাদের মন, আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে মুক্তি-সংগ্রামে। সুমহান্ পবিত্র ব্রতের কথা স্মরণ ক'রে দুনিয়ার সকল মজুর আজ একপ্রাণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনতা ছাড়া আপনাদের আর কিছু নেই, যা এই নব-জাগ্রত জীবনের পথে তুলে ধরতে পারেন বাধার মতো। কিন্তু আমরা জানি, যে হাত দিয়ে আজ আপনারা আমাদের কণ্ঠরোধ করতে যাচ্ছেন, তাই-ই কাল এসে মিলবে আমাদের হাতে বন্ধুর মতো। আপনাদের শক্তি স্বর্ণশক্তি, একান্তই প্রাণহীন, আপনাদের তা শুধু বিভক্ত করছে পরস্পর-বিধ্বংসী দলে। আর আমাদের শক্তি জীবন্ত শক্তি—মজুরদের ক্রমবর্ধমান আত্ম-সংবিতের ওপর তার প্রতিষ্ঠা। আপনারা যা করেন সবই অন্যায়; কারণ সবেরই উদ্দেশ্য মানুষের চার পাশে দাসত্বের বেড়াজাল সৃষ্টি করা। আমাদের কাজ পৃথিবীকে মুক্ত করবে আপনাদের লোভ এবং বিদ্বেষ-প্রসূত ভ্রান্তি ও বিভীষিকা হ'তে। মানুষকে আপনারা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছেন তার জীবন থেকে, তাকে আপনারা করেছেন শতধা-বিভক্ত। সাম্যবাদ এই বিচ্ছিন্ন জগতকে এক ক'রে জুড়ে এক বিরাট শ্রেণীহীন-সমাজের সৃষ্টি করবে। এ হবে, হবে, হবে।··

পেভেল থামলো। জজরা দস্তুরমতো উষ্ণ হ'য়ে উঠলেন। পেভেলের সংগে বেশ কড়া ভাষায় এবং চড়া সুরে একজন জজ কথা বলায় পেভেল শান্ত কিন্তু শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে জবাব দিলো, আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে এসেছে। আপনাদের ব্যক্তিগত অপমান করা আমার ইচ্ছা ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, এই যে রংগাভিনয় যার নাম আপনারা দিয়েছেন বিচার, তার অনিচ্ছুক

মা

দর্শক হিসাবে আপনাদের অবস্থা দেখে আমার কষ্টই হয়! শত হ'লেও আপনারা মানুষ, আর মানুষ, তা হ'ক না সে আমাদের শত্রু, তাকে পশুবলের কাছে এমন নির্লজ্জ, হীন, আত্মমর্যাদাবোধশূন্য দেখতে প্রাণে লাগে।

জজের দিকে দৃকপাত না ক'রে সে বসে পড়লো।

এণ্ড্রি এবং অন্যান্য সংগীরা পেভেলকে সানন্দে অভিনন্দিত করলো।

ষোলো

এর পরই উঠে দাঁড়ালো এণ্ড্রি। জজের দিকে চেয়ে বললো, আত্মপক্ষ সমর্থনকারী ভদ্রলোকগণ

জনৈক জজ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, তোমার সামনে আদালত, আত্মপক্ষ সমর্থনকারী ভদ্রলোকগণ নয়।

এণ্ড্রি মাথা দুলিয়ে বললো, তাই নাকি? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আমি দেখছি আপনারা বিচারক নন, বিবাদী মাত্র।

বাজে না ব'কে মামলার কথা বল।

মামলার কথা। বহুৎ আচ্ছা। আমি জোর ক'রে মনে ক'রে নিলুম যে আপনারা সত্যি-সত্যিই জজ, সাধু স্বাধীনচেতা পুরুষ,

আদালত তোমার এ সব সার্টিফিকেট চায় না।

এসব চায় না? আচ্ছা আমি বলে যাচ্ছি। আপনারা হচ্ছেন স্বাধীন মানুষ—আত্ম-পর ভেদ নেই। এখন, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছে দু'পক্ষ,

একদল নালিশ জানাচ্ছে, ও আমার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে, আমার সর্বনাশ করেছে। আর একদল জবাব দিচ্ছে, আমার লুণ্ঠন করার এবং সর্বনাশ করার অধিকার আছে; কারণ আমি সম্রাট—

দয়া ক'রে গালগল্প রাখো।

সে কি! আমি তো শুনেছি বুড়োরা গালগল্পের বড্ডো ভক্ত।

তোমার মুখ বন্ধ ক'রে দোব। মামলার কথা বলো—রসরংগ না ক'রে।

মামলার কথা! কিন্তু বেশি কি আর বলবো। যা বলবার তা তো আমার বন্ধুই বলেছে। বাকি যা তা বলবারও দিন আসছে। তা বলা হবে দিন আস্‌ছে, যখন

আমি তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করছি। ভ্যাসিলি স্যাময়লভ—

স্যাময়লভ উঠে তার কোঁকড়া চুল নেড়ে বললো, সরকারি উকিল আমাদের সংগীদের বলেছেন, অসভ্য, সভ্যতার শত্রু আমি জিগ্যেস করি, আপনাদের এই সভ্যতা চিজটা কেমন?

তোমার সংগে তা নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি আমরা। কাজের কথা বল।

• স্যাময়লভ সে কথা কানে না তুলে বলতে লাগলো, আপনারা গোয়েন্দা পোষেন, মা-বোনদের পথ-ভ্রষ্ট করেন। মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলেন যে, সে চুরি করতে, খুন করতে বাধ্য হয়। তাকে আপনারা নষ্ট করেন মদ দিয়ে আন্তর্জাতিক হত্যা-ব্যবসায় দিয়ে, বিশ্বব্যাপী মিথ্যা, হীনতা, এবং বর্বরতা দিয়ে এই তো আপনাদের সভ্যতা। হাঁ আমরা শত্রু এ-সভ্যতার শত্রু।

জজ উচ্চকণ্ঠে তাকে নিষেধ করলো, কিন্তু স্যাময়লভ যেন আরো জ'লে

উঠলো, কিন্তু আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি আর একটা সভ্যতাকে—যার স্রষ্টাদের আপনারা নির্যাতিত করেছেন, জেলে পচিয়ে মেরেছেন, পাগল ক'রে দিয়েছেন,

জজ তাকে বসিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিচার সাংগ হ'লো। দণ্ড হলো—সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, সকলের। চোখের জলের মধ্য দিয়ে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে আসামীরা রক্ষীদের সংগে আদালত হ'তে বেরিয়ে গেলো।

মাও ধীরে ধীরে আদালতের বাইরে এলেন। তখন রাত হ'য়ে গেছে। দলে দলে নরনারী এসে তাঁকে অভিনন্দিত করলো। শশেংকা এসে পেভেলের কথা জিগ্যেস করলো। মা সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন ধীরে, স্থিরভাবে। তিনি ভাবছিলেন, পেভেল গেলো, এইবার আমার পালা। আমারও এমনি বিচার হ'বে, নির্বাসন হ'বে। আমি তখন শুধু একটি আবেদন করবো, সে হচ্ছে পেভেল যেখানে থাকবে, আমায় যেন সেইখানে নির্বাসিত করে।

সতেরো

বাড়িতে এসে মা এবং শশা দু'জনে বসে বুনছে ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল। পেভেলের শশার বিয়ে হ'বে ছেলে হ'বে মা নাতিকে আদর করবেন—পেভেল বাঁধা পড়তে চাইবে না কাজের তাগিদে দূরে চ'লে যেতে চাইবে শশা বাধা দেবে না সে হবে যোগ্য সংগিনী—স্বামীর সহায় বাধা নয়—এমনি আরো কত কি।

হঠাৎ আইভানোভিচ এসে ঢুকলো। বললো, তোমরা এখান থেকে পালাও—নইলে ধরা পড়বে। গোয়েন্দা যেমন ভাবে আমার পিছু নিয়েছে তাতে খুব সম্ভব আমি শীগ্‌গিরই গ্রেপ্তার হবো। এই পেভেলের বক্তৃতা ছাপানো দরকার নিয়ে লুকিয়ে রাখো আইভানকে দিয়ো। বলে একখানা কাগজ মার হাতে দিলো।

মা বললেন, আমায় ধরবে?

নিশ্চয় এবং তাতে অনেক কাজের ব্যাঘাত হ'বে। তুমি বরং লিউদ্‌মিলার কাছে যাও।—কাল ভোরে একটা ছেলে পাঠিয়ে খবর নিয়ো, আমি আছি কি নেই।

মা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। শশা অনেক দূর তার সংগে গেলো, বললো, চমৎকার এই আইভানোভিচ। মরণ যখন ডাক দেবে, তখনো ও চলবে এম্‌নি সহজ শান্তভাবে। চশমাটা ঠিক করতে করতে শুধু বলবে, তোফা, তারপর মরবে।

মা বললেন, আমি ওকে বড় ভালোবাসি।

শশা বললো, আমি অবাক হই। ভালোবাসা? না, আমি ওকে

শ্রদ্ধা করি। কাঠখোট্টা সাদা-সিধে বাইরের অভ্যন্তরে একখানি কোমল অন্তঃকরণ—

তারপর হঠাৎ সে প্রসংগ চাপা দিয়ে বলে উঠলো, মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে। যাই মা,—গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে বুঝলে লিউদ্‌মিলার ঘরে ঢুকো না।

শশা চ'লে গেলো।

মা লিউদ্‌মিলার কাছে এসে কাগজটা তার হাতে দিলেন। তারপর আইভানোভিচের কাহিনী বললেন খুলে কেমন ক'রে সে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

লিউদ্‌মিলার চোখে-মুখে এসে পড়েছে অগ্নির রক্তিমাভা। স্থির কণ্ঠে সে বললে, কিন্তু আমার কাছে যখন তারা আসবে, আমি গুলি করবো। ধরা দোবনা। অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা কবার অধিকার আমার আছে। অন্যকে যখন যুদ্ধে উত্তেজিত করছি, তখন আমিও যুদ্ধ করবো। শান্তির অর্থ আমি বুঝি না—শান্তি আমি চাই না।

মা ধীরে ধীরে বললেন, তোমার কাছে জীবন তাহলে সুখপ্রদ হবেনা, মা।

লিউদমিলা সে কথার জবাব না দিয়ে পেভেলের বক্তৃতাটা পড়ে গেলো, বললো, বেশ। আমি এই-ই চাই, কিন্তু এতেও দেখছি শান্তির কথা আছে। এ যেন গোরস্থানে ডংকা-নিনাদ—যদিও ডংকাবাদক শক্তিমান।

তারপর পেভেলের কথা তুলে বললো, চমৎকার লোক। মহাপ্রাণ কিন্তু এমন ছেলে পাওয়া গৌরবের যেমন, তেমনি ভয়ের।

মা বললেন, গৌরবেরই মা। ভয় আর কিছু নেই।

আঠারো

পরদিন জানা গেল, আইভানোভিচ ধরা পড়েছে। ডাক্তার আইভানও এসে পড়লো কিছুকালের মধ্যে। বললো, মা তুমি এখানে? তোমাকেও খুঁজছিল। আইভানোভিচ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলো।

তাতে বিপদ কাটান যাবে না, মা। তা থাক। জনকয়েক ছেলে কাল পেভেলের বক্তৃতাটা হেক্টোগ্রাফে পাঁচশ কপি ছাপিয়েছে—শহরে ছড়াতে চেয়েছিল। আমি তার বিরুদ্ধে—ছাপানো কপি শহরে ছড়ানো ভালো এগুলো অন্যত্র পাঠানো যাবে।

মা সোৎসাহে বললেন, আমায় দাও, আমি নেটাশাকে দিয়ে আসছি।

ডাক্তার বললেন, এখন তোমার একাজ করতে যাওয়া ভালো হবে কিনা জানি না। এখন বারোটা, দুটো পাঁচে গাড়ি। পৌছাবে পাঁচটা পনেরোয় —দেরি তেমন হয় না। কিন্তু কথা তা নয়।

কথা কি? কাজটা ভাল ভাব হাঁসিল করা, এই তো। তা আমি পারবো। লিউদ্‌মিলা বললো, কিন্তু তোমার পক্ষে এ বিপজ্জনক।

কেন?

ডাক্তার বললেন, কারণ হচ্ছে এই, আইভানোভিচ ধরা পড়ার এক ঘন্টা আগে তুমি উধাও হয়েছো, তারপর মিলে তুমিও গেলে, আর ইস্তাহারের আবির্ভাব হলো।

মা জেদ ক'রে বললেন, না, আমি যাবো। ফিরে এলে যখন ধরতে আসবে, তখন একটা-কিছু ব'লে তাদের ফেরাতে পারব।

ডাক্তার বললেন, বেশ, তাই হ'ক। স্টেশনে বসে ইস্তাহার পাবে।

ডাক্তার চ'লে যেতে লিউদ্‌মিলা বললেন, চমৎকার তুমি, মা।

আমারও এক ছেলে আছে তেরো বছর তার বয়স, কিন্তু সে আজ থেকেও নেই। তার বাপ আমার স্বামী সহকারি সরকারী উকিল। হয়তো এদ্দিনে সরকারি উকিল হ'য়ে গেছেন। ছেলে তার সংগে। ছেলে কেমন হ'বে সময়-সময় ভাবি। যাদের আমি সেরা মানুষ ব'লে মনে করি তাদের শত্রু যে, তার হাতে পড়েছে আমার ছেলে। আমার কাছে থাকতে পারছে না। আমি আছি এক ছদ্মনামে। আট বছর তাকে দেখিনা। আট বছর

ধীরে ধীরে জানলার কাছে যেয়ে বাইরে ম্লান আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, সে যদি আমার সংগে থাকতো, কত জোর পেতাম আমি। বুকে সর্বক্ষণ এই ব্যথাটা লেগে থাকতোনা। এর চেয়ে যদি মরতোও সে, আমার পক্ষে তা সওয়া বরঞ্চ সহজ হ'তো। জানতুম সে মৃত, কিন্তু শত্রু নয়। মাতৃস্নেহের চাইতেও যা মহৎ, যা প্রিয়তর, যা বেশি দরকারী সেই ব্রতের শত্রু নয়।

আহা মা, ব'লে মা লিউদ্‌মিলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

লিউদমিলা তেমনি অগতভাবে বলছে, হাঁ, তুমি সুখী মা, তুমি সুখী। কী মহান দৃশ্য মা আর ছেলে এক সাথে পাশাপাশি· এ খুব কম মেলে।

মা যেন নিজের অজ্ঞাতে ব'লে ফেললেন, হাঁ মা, এ সুন্দর অভিনব এ যেন এক নবীন জীবন। তোমরা সবাই সত্যপথের যাত্রীদল পাশাপাশি চলেছো যাদের আগে দেখিনি, তারা হঠাৎ যেন পরম আত্মীয় হ'য়ে গেছে। সব কথা আমি বুঝি না, কিন্তু এটা বুঝি মা বুঝি ছেলেরা দুনিয়ায় পথ বেয়ে এগোচ্ছে সকলে একটি লক্ষ্যের দিকে·· সমস্ত অন্যায়কে পায়ে দ'লে, সমস্ত অন্ধকারকে দূরীভূত ক'রে, সমস্ত তত্ত্বকে আয়ত্ত ক'রে, সমস্ত মানুষের পক্ষ

নিয়ে—তারা এগিয়ে চলেছে। তরুণ তারা, শক্তিমান তারা, তাদের অদম্য শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে, এক উদ্দেশ্য সাধনে—সে হচ্ছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। মানুষের সকল দুঃখকে তারা জয় করতে চলেছে, পৃথিবীর বুক হতে দুঃখকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলার জন্য তারা অস্ত্রধারণ করছে, যা-কিছু বীভৎস তা দমন করবে। একজন বলেছিল আমায়, আমরা এক নতুন সূর্য প্রজ্বালিত করবো—হাঁ, তারা তা করবে। সমস্ত জীবনকে একপ্রাণে গাঁথবে তারা, সমস্ত ছিন্ন হৃদয়কে একত্র সম্মিলিত করবে তারা। জীবনকে শুদ্ধ, পবিত্র, উজ্জ্বল করবে তারা।—

ভাবে তন্ময় হ'য়ে মা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ সেই সূর্য—গৌরবময় স্বর্গ সুষমাদীপ্ত মানুষের সুখসূর্য। সমস্ত ভুবনকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল ক'রে রাখবে এ পৃথিবীর সবাই সমস্তখানি দীপ্ত হ'বে মানুষের প্রেমে, বিশ্বের সমস্ত-কিছুর ওপর মানুষের প্রীতিতে। এই সত্য যুক্তি-পন্থীরা সকলের কাছে ব'য়ে নিয়ে যাবে প্রেমের আলোক, সমগ্র দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলবে তারা এক নতুন আশমানে, সমস্ত-কিছুকে ভাস্বর ক'রে তুলবে তারা অন্তরের অনির্বাণ জ্যোতিতে, এই নবযাত্রীদের এই বিশ্বপ্রেম হ'তে উদ্ভূত হবে এক নবজীবন। কে নির্বাণ করবে এ প্রেমের আলোক? কোন্ শক্তি এর চাইতে মহত্তর? কে দলিত করবে এ শক্তিকে? পৃথিবী এর জন্ম দিয়েছে, সমস্ত মানুষ এর জয়-কামনা করেছে। রক্তের নদী শুধু তা কেন, সমুদ্র বইয়ে দাও, এ নিভবে না।

লিউদ্‌মিলার হাত ধ'রে তিনি বললেন, মা, মানুষের কাঙ্ক্ষিত আলোক যে তার নিজের মধ্যেই আছে, একথা জানা যে কতো হিতকর তা তোমায় কি ক'রে বলবো। এমন দিন আসবে, যখন মানুষ এটা বুঝবে, মানুষের প্রাণ সে আলোকে মণ্ডিত হ'বে। এর অনির্বাণ শিখায় সকলের প্রাণ জ্ব'লে উঠবে।

মা

· পৃথিবীতে আজ জন্ম নিয়েছে এক নর দেবতা সে দেবতা মানুষ সমস্তের জন্য সমস্ত-কিছু, সমস্ত-কিছুর জন্য সমস্ত, প্রত্যেকের জন্য ষোলো-আনা জীবন, ষোলো-আনা জীবনের জন্য প্রত্যেকে এমনিভাবে আমি তোমাদের সবাইকে বুঝেছি। এই দুনিয়ায় তোমাদের আবির্ভাব এরি জন্য। সত্যি-সত্যিই তোমরা সবাই স্যাঙাৎ, আত্মীয় কারণ তোমরা সবাই সত্যের সন্তান সত্য তোমাদের জনম দিয়েছে—সত্যের দৌলতে তোমরা বেঁচে আছো। যখনই নিজের মনে উচ্চারণ করি, স্যাঙাৎ, তখনই যেন প্রাণ দিয়ে শুনি, তোমরা যাত্রা করেছো সর্বস্থান হ'তে দলে দলে একই কার্যের সংকল্প নিয়ে। কানে যেন ভেসে আসে মত্ত হর্ষধ্বনি। দুনিয়ার সমস্ত মন্দিরের সব ঘণ্টা যেন একসংগে বেজে উঠেছে অপূর্ব এক উৎসব-সমারোহে।

লিউদ্‌মিলা আশ্চর্য হ'য়ে মার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, অপূর্ব, এ যেন উচ্চগিরিশিরে সূর্যোদয়।

উনিশ

সময় মতো মা স্টেশনে গিয়ে হাজির হ'লেন। একটি যুবক ইস্তাহার-ভরা একটা হলদে ব্যাগ দিয়ে গেলো তাঁর কাছে। মা একটা বেঞ্চিতে ব'সে ট্রেণের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

গোয়েন্দারাও নিশ্চিন্ত ছিলোনা। তারা মার চারিদিকে এসে জড়ো

হ'ল। এক বুড়ো তাঁর দিকে চাইলো ক্রোধ-রক্তিম দৃষ্টিতে। মা তার দিকে চেয়ে সংযতকণ্ঠে বললেন, কি চাও তুমি?

কিছু না।

একজন ব'লে উঠলো—বুড়ি চোর কোথাকার।

আমি চোর নই, মা গর্জন করে উঠলেন।

দেখতে দেখতে চারপাশে বেশ একটা ভিড় জমে গেলো।

কি, কি, ব্যাপার কি?

একটা গোয়েন্দা।

চোর।

কে, ঐ বুড়ি?

চোর হলে কখনো চেঁচায়?

মা জোর গলায় বললেন, আমি চোর নই। কাল ওরা রাজনৈতিক আসামীদের বিচার করেছে। তাদের মধ্যে একজন পেভেল একটা বক্তৃতা দিয়েছিলো এই সেই বক্তৃতা আমি লোকদের কাছে তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, যাতে তারা এ পড়ে সত্য চিন্তা করে। এই বলে কাগজ বের ক'রে উঁচুতে তুলিয়ে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিলেন।

একজন ব'লে উঠলো, এতে বখ্‌শিস্‌ যা মিলবে তা বিশেষ লোভনীয় নয়।

হাঁ।

মা দেখলেন, সবাই কাগজ হাতাহাতি ক'রে নিয়ে পকেটে, বুকে গুঁজে রাখতে লাগলো। উৎসাহিত হ'য়ে আরো কাগজ ছড়াতে ছড়াতে বললেন, এর জন্য, মানুষের কাছে এই পবিত্র সত্য প্রচার করার জন্য আমার ছেলে এবং তার সংগীদল নির্বাসিত হয়েছে।

বিস্মিত, মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী আরো চেপে দাঁড়ালো মার দিকে। ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। মা বলতে লাগলেন, দারিদ্র্য, অনশন, ব্যাধি··· শ্রম ক'রে গরীবের লাভ হয় এই। সমাজের এই অবস্থা আমাদের ঠেলে দেয় চুরির দিকে, অন্যায়ের দিকে? আর আমাদের মাথার ওপর ব'সে আছে ধনীরা—শান্তিতে এবং তৃপ্তিতে। যাতে আমরা তাদের বাধ্য থাকি তাই তাদেরই হাতে পুলিশ, সরকার, সৈন্য-সামন্ত সব-কিছু। সবাই আমাদের বিরুদ্ধে, সব-কিছু আমাদের প্রতিকূলে। আমাদের জীবন আমরা নষ্ট ক'রে চলেছি দিনের পর দিন শ্রমে—নোঙ্‌রামীতে—প্রবঞ্চনায়, আর ওরা মজা লুটছে, রাজভোগ ওড়াচ্ছে আমাদের শ্রমের সুবিধা নিয়ে। কুকুরের মতো শৃংখলাবদ্ধ ক'রে রেখেছে আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে। আমরা কিছু জানি না: আতংকে আমরা সবকিছুকেই ভয়ের চোখে দেখি। আমাদের জীবন এক অমাবস্যার অন্ধকার-ঘেরা রাত্রি—এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। মদের বিষে আচ্ছন্ন ক'রে রেখে ওরা আমাদের রক্তপান করছে। ওরা অতি-ভোজনে ভুঁড়ি বাগাচ্ছে, বমি করছে, ওরা লোভ-শয়তানের চেলা তাই নয় কি?

তাই-ই।

মা দেখতে পেলেন, ভিড়ের পিছনে দুইজন পুলিশ এবং সেই গোয়েন্দা। অমনি তাড়াতাড়ি কাগজগুলো ছড়াতে গেলেন, কিন্তু কার যেন একখানা অপরিচ্ছন্ন হাত এসে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পলকে অদৃশ্য ক'রে ফেললো—তারপর প্রশ্ন হ'ল, কাকে বলবো? কাকে খবর দেবো?

মা তাতে কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, এই জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে বদলাতে, সকল মানুষকে মুক্তি দিতে, আমার মতো তাদের জীবন্ত কবর হ'তে তুলে নবজীবন দিতে এগিয়ে এসেছে কতিপয় যুবক—যারা তাদের

গোপন প্রাণে পেয়েছে সত্যের দর্শন, গোপনে ; কারণ তোমরা জানো, মানুষ আজ যা সত্য, তা খোলাখুলি বলতে পারেনা। ওরা তা'হলে গুলি করবে, টুটি টিপে ধরবে, জিভ কেটে ফেলবে। ধন একটা শক্তি কিন্তু তা সত্যের সুহৃদ নয়। সত্য ধনীর চির-শত্রু, মরণ-শত্রু। আমাদের ছেলেরা দুনিয়ায় এই সত্যের বার্তা প্রচারে বেরিয়েছে। তারা পবিত্র, তারা জ্যোতির্ময়। সংখ্যা তাদের অল্প, শক্তি তাদের কম,—কিন্তু দলে বাড়ছে তারা। তরুণ প্রাণ সমর্পণ করেছে তারা স্বাধীন সত্যের ব্রতে, সত্যকে পরিণত করছে তারা সর্বজয়ী শক্তিতে। তাদের প্রাণের পথ দিয়ে সেই সত্য এসে ঢুকবে আমাদের কঠোর জীবনে।—আমাদের উদ্দীপিত ক'রে তুলবে, সঞ্জীবিত করে তুলবে ; আত্ম-বিক্রয়ী যারা, ধনী যারা তাদের অত্যাচার থেকে টেনে তুলে বাঁচাবে৷ তোমরা বিশ্বাস করো একথা।

ভাগো এখান থেকে—পুলিশরা ভিড় ঠেলতে ঠেলতে চেঁচাতে লাগলো।

বেঞ্চির ওপর উঠে নাও।

দরকার নেই—এখনই গ্রেপ্তার হবো।

তাড়াতাড়ি ব'লে যাও। এসে পড়লো ব'লে।

মা বললেন, সেই সত্য-প্রচারকদের, সর্বহারা-দরিদ্র বান্ধবদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও—আপোস কোরোনা, বন্ধুগণ, আপোস কোরোনা। শক্তি-গর্বীদের কাছে মাথা নুয়িয়োনা। ওঠো, জাগো মজুর ভাইসব,—এই জীবনের নিয়ন্তা তোমরা, তোমাদের শ্রমের দৌলতে সবাই বেঁচে আছে, অথচ তোমরাই বন্দী। হাত তোমাদের খোলা—শুধু কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য। চেয়ে দেখো, তোমাদের চারদিকে বন্ধন। ওরা তোমাদের খুন করছে, তোমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করছে। আজ মন-প্রাণ একীভূত ক'রে এক শক্তিতে উঠে দাঁড়াও। সমস্ত বাধা পরাভূত হবে। তোমরা ছাড়া

তোমাদের আর বন্ধু কেউ নেই—এই কথাই মজুরদের বন্ধুরা তাদের বলতে চেয়েছে এবং বলতে গিয়ে কারাগারে, নির্বাসনে পলে পলে প্রাণ দিয়েছে। অসৎ লোকেরা কি এমনিভাবে কথা বলে? প্রতারকরা কি এমনিভাবে প্রাণ দেয়?

পুলিশরা 'ভাগো' 'ভাগো' বলে উপর্যুপরি ঠেলতে লাগলো লোক-গুলোকে। মার প্রাণ যেন কথার ভারে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে ঝংকৃত হ'তে লাগলো গানের মতো। কম্পিত ভগ্নকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ছেলের এই বাণী এক-ন্যায়নিষ্ঠ শ্রমিকের বাণী—আত্মবিক্রয় যে করেনি, তার বাণী। এর সত্যতা তোমরা বুঝতে পারবে, এর স্পষ্ট তেজোদৃপ্ত ভাষা হ'তে, নির্ভীক এ ভাষা। হে আমার মজুর বন্ধুগণ, এই নির্ভীক, নিত্য জ্ঞানদীপ্ত বাণী আজ তোমাদের কাছে উপস্থিত। প্রাণ খুলে একে গ্রহণ করো, এ দিয়ে প্রাণকে পুষ্ট করো। তোমাদের শক্তিলাভ হবে, সর্ব আপদ হ'তে আত্মরক্ষা করার, সত্যের পরিপন্থী, যুক্তির প্রতিকূল সব-কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। এ বাণী গ্রহণ করো, বিশ্বাস করো,—একে পাথেয় ক'রে বিশ্ব-মানবের সুখের পথে যাত্রা করো, পরম আনন্দভরে এক নবজীবনের অভিমুখে অগ্রসর হও!

মায়ের বুকে এক প্রচণ্ড ঘুসি এসে পড়লো। মা ট'লে বেঞ্চির ওপর পড়ে গেলেন। জনতার ওপরও অবিশ্রাম প্রহার চলতে লাগলো।

মা একটু পরেই শেষ শক্তি প্রয়োগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাইসব, তোমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তি একত্র ক'রে এক মহাশক্তির সৃষ্টি করো।

একজন বৃহদাকার পুলিশ তার কলার ধ'রে ধমকে উঠলো, চুপ রও। জনতাকে ভয় দেখিয়ে বলতে লাগলো, ভাগো।

মা বললেন, কোনো-কিছুতে ভয় পেয়ো না। ওরা কি যন্ত্রণা দেবে? এর চাইতে ঢের-ঢের বেশি যন্ত্রণা জীবন-ভোর সইছো তোমরা।

চুপ কর বলছি, ব'লে একজন পুলিশ তার একহাত ধরলো, তারপর অন্যদিক থেকে আর একজন অন্য হাতটা ধ'রে লম্বা পা ফেলে মাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো।

মা বলতে লাগলেন, এর চেয়ে ঢের ঢের বেশি নির্যাতন অহর্নিশ গোপন-কাঁটার মতো তোমাদের অন্তর-বিদ্ধ ক'রে তুলছে, তোমাদের শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।

গোয়েন্দা গর্জন করে উঠলো, এই বুড়ি, থাম।

মা বেপরোয়া হ'য়ে বলতে লাগলেন, এই নব-উদ্বুদ্ধ আত্মাকে হত্যা করে কার সাধ্য?

একটা গাল দিয়ে গোয়েন্দাটা মার মুখের ওপর এক চড় লাগালো। একমুহূর্তের জন্য মা চোখে অন্ধকার দেখলেন। রক্তের নোনা স্বাদে তাঁর মুখ ভরে এলো। কানে এলো, ক্ষিপ্ত জনতার চিৎকার, খবর্দার, ওঁকে মেরো না। শয়তান কোথাকার দোব এক ঘা বসিয়ে

মা উৎসাহিত হ'য়ে বলতে লাগলেন, রক্তে ওরা মুক্তিকে ডুবিয়ে দিতে পারবেনা, সত্যের শিক্ষাকে নিভিয়ে দিতে পারবে না তারা।

মার মাথায় পিঠে ঘাড়ে ঘা পড়তে লাগলো। চারদিকের সব-কিছু যেন ঘুরতে আরম্ভ করলো। চারদিকে চিৎকার, তর্জন-গর্জন, হুমকি কানে যেন তালা লাগছে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে।

মা

পা নুয়ে পড়ছে, শরীর কাঁপছে, জলছে, টলে পড়ছেন কিন্তু চোখ বন্ধ হয়নি। মা দেখলেন, জনতার চোখে এক অপূর্ব উত্তেজনা।

তাকে ঠেলে এক দোরের ভিতর দিয়ে ঢোকানো হ'ল। পুলিশের কবল থেকে হাত ছিনিয়ে দরজার কাঠ ধরে মা বলে উঠলো, রক্তের সমুদ্র বহালেও সত্যকে ওরা ডুবিয়ে মারতে পারবে না। ·

পুলিশেরা মার হাতের ওপর ঘা লাগালো।

বোকা ওরা' নিজেদের ওপর জমিয়ে তুলছে বিদ্বেষের স্তূপ, একদিন তারই তলে চাপা পড়বে ওরা

কে যেন মার গলা টিপে কণ্ঠরোধ করলো মার গলা থেকে মোটা সুরে বেরিয়ে এলো : নির্বোধ হতভাগ্য ওরা, ওদের জন্য দুঃখ হয়।

সমাপ্ত